বাঙালি মুসলমানের মন

আহমদ ছফা

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
★2023★

সূচিপত্র

উৎসর্গ.....2
একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশ বাহাত্তর.....19
বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে.....32
বাংলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা.....38
বাঙালি মুসলমানের মন.....86
বার্ট্রান্ড রাসেল.....123
ভবিষ্যতের ভাবনা.....137
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র.....147
রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনা.....157
শিক্ষার দর্শন.....168

উৎসর্গ

দুই জন সংস্কৃতিপ্রেমিক হৃদয়বান মানুষ

লুতফর রহমান সরকার

মোস্তফা কামাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

.

প্রাক ভাষণ

বর্তমান গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত রচনাগুলো অনধিক বার বছর সময় সীমার মধ্যে লিখিত। নাম প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। মাসিক সমকালের কোনো একটি সংখ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনা' রচনাটি ড. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ'-এ স্থান পেয়েছে এবং সেজন্য ওটি লিখিত হয়েছিল। ভবিষ্যতের জন্য রচনাটি ১৯৬৯ সালের দিকে অধুনালুপ্ত 'কণ্ঠস্বর'-এর কোনো একটি সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র লেখাটি 'পারাপার' নামে আরেকটি সংকলনে ১৯৭৩ সালের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ফেব্রুয়ারি উনিশশ বাহাত্তর' রচনাটি উনিশশ বাহাত্তর সালে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানোপলক্ষে লিখতে হয়েছে। পরে সেটি জাতীয়

গ্রন্থকেন্দ্রের 'বই' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার দর্শন প্রবন্ধটি ১৯৭২ কি '৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেমিনারে পঠিত হয়েছিল। পরে কোথায় ছাপা হয়েছিল মনে পড়ছে না। 'বার্ট্রান্ড রাসেল' লেখাটি অধুনালুপ্ত 'মুখপত্র' পত্রিকায় ১৯৭০ সালের দিকে ছাপা হয়। 'বাংলার ইতিহাস' প্রসঙ্গে রচনাটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতায় সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'অভিযান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্য: সুলতানের সাধনা' শীর্ষক রচনাটি লেখা হয়েছে মাত্র মাসকয়েক আগে। এটি 'মূলভূমি' নামে একটি সংকলনে সবে ছাপা হলো।

এই গ্রন্থের লেখাগুলো সূচি অনুসারে না দেখে লেখার কালানুসারে বিচার করলে লেখকের মানস পরিণতির একটা ছায়া বোধ করি দৃষ্টিগোচর হবে।

রচনাগুলো প্রেসে দেয়া হয়েছিল তিন বছর আগে এবং প্রায় অর্ধেকের বেশি ছাপাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এতদিন পর। সেই দুঃখের কথা বলে লাভ নেই। তবু ভাবতে ভাল লাগছে ১৯৮১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

বিনীত
আহমদ ছফা
২১ ফেব্রুয়ারি '৮১
১০৭ আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

.

উত্তর ভূমিকা

এই গ্রন্থের নাম প্রবন্ধটি লেখার পেছনে সামান্য ইতিহাস আছে। তখন জিয়াউর রহমানের রাজত্বকাল। অধ্যাপক আবুল ফজল তার শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা। আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল এবং তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধের উপর তিনি তিনটে প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখক জীবনে আবুল ফজল সাহেবের কাছে আমি অনেক পরিমাণে ঋণী। তিনি আমার মতো অনেক তরুণেরই প্রেরণার উৎস ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির পূজারী এবং ঘঘাষিতভাবে নাস্তিক। যেহেতু ফজল সাহেব নাস্তিকতা প্রচার করতেন, প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ লোকেরা তাকে ভীষণ খারাপ চোখে দেখত এবং প্রায়ই পত্র পত্রিকায় তাকে গালাগাল করা হতো।

একদিন সকালবেলা আমি প্রাতভ্রমণ করতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়েছি। খুব অবাক হয়ে লক্ষ করলাম সকালবেলা আবুল ফজল সাহেব মোটাতাজা উঁচা লম্বা ফর্সা মতোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছেন। তার মাথায় একটা গোল টুপি। আবুল ফজল সাহেবের মাথায় টুপি দেখে আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সালাম করে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জানালেন,

সিরাত মাহফিলে যোগ দেবেন বলে বেরিয়েছেন। তার সঙ্গের মানুষটির পরিচয়ও আমি পরে জানতে পেরেছি। তিনি ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমানের আকাশ সেনা প্রধান জনাব এম এ জি তাওয়াব। ধর্ম নিয়ে অত্যধিক বাড়াবাড়ির কারণে এই ভদ্রলোক জিয়াউর রহমানকে অনেকবার বেকায়দায় ফেলেন। শেষ পর্যন্ত জেনারেল জিয়া তাওয়াব সাহেবকে তার শ্বশুরের দেশ জার্মানিতে চলে যেতে বাধ্য করেন।

আমি আবুল ফজল সাহেবকে টুপি পরে সিরাত মাহফিলে যোগ দিতে যাওয়ার ঘোষণা শুনে মনে মনে একটা চোট পেয়ে গেলাম। এই ঘোষিতভাবে নাস্তিক ভদ্রলোকটি আজকে ক্ষমতার স্বাদ পেতে না পেতে নিজেকে প্রচণ্ড ধার্মিক বলে পরিচয় দিতে চাইছেন। এরকম কাণ্ড কি করে ঘটে সেটা আমাকে ভয়ানক রকম চিন্তিত এবং উতলা করে তোলে।

অনেক নাস্তিক শেষ পর্যন্ত আস্তিকে পরিণত হয়েছে এরকম ভুরিভুরি লোকের নাম আমি জানি। কিন্তু আবুল ফজল সাহেবের মতো লোক যিনি সারাজীবন নাস্তিকতার পুরোহিতের ভূমিকা পালন করে গেছেন তিনি ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে না আসতেই কোনোরকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না দিয়েই একটি ভিন্ন পরিচয়ে নিজেকে চিহ্নিত করতে তৎপর হয়ে উঠলেন সেটাই আমাকে সবচাইতে বিস্মিত করেছে।

এই যে হঠাৎ পরিচয় পাল্টে ফেলা তার পেছনে আমার মনে হয়েছিল একগুচ্ছ সামাজিক কারণ বর্তমান। আবুল ফজল সাহেব উপলক্ষ মাত্র, কারণ নন। বাঙালি মুসলমান

সমাজের ভেতরে এমন কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে যেগুলো ব্যক্তিকে কোনো বিশ্বাসের বিন্দুতে স্থির থাকতে দেয় না। ডানে কিংবা বাঁয়ে হেলতে বাধ্য করে। মনের এই উত্তেজিত অবস্থাতে আমি এক রাতে একটুও না থেমে বাঙালি মুসলমান রচনাটি লিখে শেষ করি।

লেখাটি যখন প্রথম সমকালে প্রকাশিত হয়, আমাদের দেশের চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে কিছু আলোড়নও আমি লক্ষ্য করি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবনে গোলাম সামাদ আমার লেখার তীব্র সমালোচনা করে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমাকেও ওই একই সমকাল পত্রিকায় জনাব এবনে গোলাম সামাদের অভিযোগের একটা কড়া জবাব দিতে হয়।

বর্তমান গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি জমা দেয়ার প্রায় দুবছর পরে বাংলা একাডেমী ছাপার কাজ শুরু করে। লেখাটি যখন চার ভাগের তিন ভাগ ছাপা শেষ হয়েছে একাডেমী কর্তৃপক্ষকে আমি অনুরোধ করি শেষের দিকে আমি এই গ্রন্থে একটি বড়সড় লেখা সংযোজন করতে চাই এবং সেজন্য তাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার মনে সামান্য অস্বস্তি ছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজকে নানা দিক থেকে আমি অভিযুক্ত করছি অথচ আমার জন্ম এই সমাজে ঘটেছে। এই সত্য কোনোদিন অস্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। নিজের সমাজের অবিমিশ্র নিন্দে করে কোনো মানুষ ভাল কিছু করতে পারে না। সেজন্য আমি মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম এমন কিছু খুঁজে পাই কিনা, যা দিয়ে বাঙালি মুসলমানের দিক সামান্য হলেও আমি উল্লেখ করতে পারি।

এই রচনা লেখার প্রায় পাঁচ বছর আগে আমার সঙ্গে প্রয়াত শিল্পী এস এম সুলতানের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং পরিচয় পরে বন্ধুত্বে রূপ নেয়। সুলতানকে আমার বাঙালি মুসলমান সমাজে নয় শুধু গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে একজন অনন্যসাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই মহান শিল্পীর প্রতি উপেক্ষা এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে যে পাপ করে আসছিল সেই পাপ স্খলনেরও একটা পন্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আমি তীব্রভাবে অনুভব করে আসছিলাম। যেভাবে সুলতান এবং তার শিল্পকর্ম দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন সেই জিনিসটি তুলে আনতে পারছিলাম না বলে আমাকে ক্রমাগত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই সময়ে দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বিস্তৃত রচনাটি আমি শেষ করি এবং তার পরে বাংলা একাডেমী বইটি প্রকাশ করে।

'বাঙালি মুসলমানের মন' গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এই গ্রন্থের পক্ষে বিপক্ষে নানা ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করতে থাকেন। আমার এই রচনার বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে থেকে কয়েকটির কথা আমি তুলে ধরতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক (ভূতপূর্ব সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি) আবুল কালাম আজাদ জনাব অলি আহাদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় অন্যূন ছয় মাস ধরে আমার লেখা 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে একটানা লিখে যেতে থাকেন। এই হ্রস্বকায় করিতকর্মা অধ্যাপককে যিনি জানেন,

অবশ্যই একমত হবেন, তার প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা কি রকম ভয়ংকর হতে পারে। আজাদ সাহেব ইত্তেহাদ পত্রিকায় নিবন্ধসমূহ লিখে নিবৃত্ত হতেন না, তার নিবন্ধ সংবলিত পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে আমার দরজার তলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেন। আমি তখন থাকতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে এবং তিনি থাকতেন আমার পেছনে শিক্ষকদের কোয়ার্টার্সে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভালমন্দ যাই লিখুক না কেন আমি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব না। কারণ আমি আবুল কালাম আজাদ সাহেবের কৌশলটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। তিনি তার লেখাগুলো পাঠ করিয়ে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছিলেন। আমি ঠিক করেছিলাম তার ফাঁদে কিছুতেই ধরা দেব না। তাই দরজা খুলে যখন দেখতাম একটা ইত্তেহাদ পত্রিকা মেঝের উপর শুয়ে আছে, আমি কালবিলম্ব না করে সেটা জ্বালিয়ে ফেলতাম। তারপর আবুল কালাম আজাদ সাহেব একটা ভিন্নপথ ধরলেন। ইত্তেহাদের প্রকাশিত নিবন্ধগুলো দিয়ে তিনি একটা পুস্তিকা প্রকাশ করলেন এবং সেই পুস্তিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করে এলেন। কিন্তু শিক্ষকরা কেউ উচ্চবাচ্য কিছু করলেন না। এই ছোট মানুষটি মোটেই দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি এক শুক্রবারে স্বরচিত পুস্তিকাটি হাতে করে কাঁটাবন মসজিদে এলেন। নামাজ শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের কাছে নিবেদন করলেন, আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমানদের হিন্দুদের জারজ সন্তান বলেছে। সুতরাং তার একটা বিহিত হওয়া দরকার। আমার ধারণা মুসল্লি সাহেবরা আবুল কালাম সাহেবের চরিত্র জানতেন, তাই তারা চেতে ওঠার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেননি।

এভাবে তো আবুল কালাম পর্ব ছুটল। এরপর আক্রমণ এল সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় আমাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে পর পর দু-সংখ্যায় একটি লেখা প্রকাশিত হলো। এক ভদ্রলোক ছদ্মনামে এ রচনাটি প্রকাশ করেছেন। পরে আমি এ ভদ্রলোকটির নাম পরিচয়ও উদ্ধার করতে পেরেছি। তিনি ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য এবং পরবর্তীকালে জিয়া সরকারের একজন মন্ত্রী। যতই নিন্দে সমালোচনা হোক তথাপি লেখাটির মধ্যে একটা শক্তি ছিল যা আমাদের দেশে প্রধান এবং খ্যাতনামা গদ্য লেখকদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমি যে যুক্তি শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে বাঙালি মুসলমানের মানসজীবন বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নিয়েছিলাম আমার সেই চিন্তন পদ্ধতিটি অনেকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রতি সামান্য ঋণের কথা উল্লেখ করলে তাদের সম্মানহানি ঘটে সেজন্য আমার নামটি একেবারেই উল্লেখ করেন নি।

একটা দুঃখের কথা বলি, একবার বাংলা একাডেমী সিদ্ধান্ত নিলেন তারা একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করবেন। যে সংকলনে বাংলা সাহিত্যের প্রধান গদ্য লেখকদের রচনা স্থান পাবে। একেবারে কনিষ্ঠ লেখক হিসাবে আমারও একটি লেখা গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করেছেন। আমাকে যখন একটি লেখা দিতে বলা হলো আমি 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধটি একাডেমীতে জমা দিলাম। কিছুদিন পর একাডেমীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে জানালেন, সম্পাদকমণ্ডলী আমার রচনাটি বিশেষ কারণে গ্রহণ করতে পারছেন না, আমি যেন তাদেরকে অন্য একটি রচনা দিয়ে বাধিত করি। এই সংবাদটি শুনে আমি

অত্যন্ত চটে যাই এবং একাডেমীকে চিঠি লিখে জানাই, প্রস্তাবিত প্রবন্ধ সংকলনের যে চারজন সম্পাদক রয়েছেন তাদের মধ্যে তিনজনই এই লেখা থেকে মালমসলা সংগ্রহ করে দেদার লেখা লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকবৃন্দ কি কারণে এই রচনাটি গ্রহণ করতে চাননি আমাকে লিখে জানালে বাধিত হব। একাডেমী আমাকে কোনো কিছু জানাননি এবং সেই গদ্য গ্রন্থটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি, যদিও লেখকদের সম্মানী পরিশোধ করা হয়েছিল।

আমাকে এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলতে হবে এবং বলব রচনার শেষ পর্যায়ে। এখানে একটি সংবাদ জানিয়ে রাখতে চাই। কলকাতাতে যখন গ্রন্থটি প্রকাশ হতে যাচ্ছিল সে সময়ে মিরান্দা প্রকাশনীর শ্রীমতি পাপিয়া রায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সদ্য প্রয়াত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ওই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন। তারপর থেকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একটি কর্তব্য বলে মনে করছি।

এই গ্রন্থে 'বাঙালি মুসলমানের মন' ছাড়াও আরও কিছু রচনা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে 'ভবিষ্যতের ভাবনা' রচনাটি আমি লিখি ছাত্রজীবনে। রচনাটি জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আইয়ুব খান সাহেবের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন যখন রেডিও টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করার ঘোষণা দেন, সেই সময়ে আমি আমার এক বন্ধু কাজী সিরাজ মিলে ঠিক করি

এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত পরিচিতিসম্পন্ন তরুণ-প্রবীণ কবি-লেখকদের রচনা সংগ্রহ করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করলে সবচাইতে ভাল হয়। আমরা প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্ট ওয়েজকে এই প্রস্তাবিত গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি করাই। তারপর আমাদের শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান সাহেবকে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে অনুরোধ করি এবং তিনি রাজিও হন। এই উপলক্ষে আমি 'রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনা' শীর্ষক লেখাটি লিখি। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ওই সংকলনে এটি ছিল একমাত্র ছাত্রলিখিত রচনা। আমার লেখাটির অংশবিশেষ প্রয়াত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্টেটসম্যান পত্রিকায় ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

'বাঙালির ইতিহাস প্রসঙ্গে' লেখাটি লেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। তখন প্রয়াত কবি সিকান্দার আবু জাফর কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক 'অভিযান' পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে পাঠ করার জন্য 'শিক্ষার দর্শন' শীর্ষক রচনাটি লিখিত হয়।

একটু ভুল হয়ে গেল। ছাত্র থাকার সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখেছি 'বার্ট্রান্ড রাসেল'ও সেই পর্যায়ভুক্ত রচনা। লেখাটি ড. আহমদ শরীফের বাড়িতে পাঠচক্রের একটি সাপ্তাহিক সভায় পঠিত হয়েছিল।

প্রথম সংস্করণে যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছিল অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় বর্তমান সংস্করণটিতে চারটি প্রবন্ধ বাদ দেওয়া হলো। 'বাঙালি মুসলমানের মন' গ্রন্থটিতে অন্তত

তিনটি রচনা স্থান পেয়েছে; যেগুলোর জন্য আমি সামান্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারি। প্রথমত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের একটি চরিত্র প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করব। হোসেন মিয়ার চরিত্রটিকে আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেটি একেবারে নতুন। ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে কোনো সমালোচনা মানিকের সৃষ্ট ওই অপূর্ব চরিত্রটির এরকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাননি।

গৌতম ঘোষ 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির যে চিত্ররূপ দিয়েছেন তাতে খুঁটিয়ে বিচার করলে আমার এ প্রবন্ধটির প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। গৌতম যে উৎকৃষ্ট ছবি করতে পারেননি সেই দোষ তো আমার নয়। আমি তো চরিত্রটির সঠিক ব্যাখ্যা করেছিলাম।

দ্বিতীয় যে প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করতে চাই সেটি হলো 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্য : এবং সুলতানের সাধনা'। এই বিশেষ রচনাটি লিখতে পারার কারণে আমি মনে করি একটা বড় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছি। পঞ্চাশের দশকের দিকে শিল্পী এস. এম. সুলতান ইউরোপ আমেরিকায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কনটেমপরারি গ্রেট মাস্টার্স পিকাসো, ডালি, মাতিস, পল ক্লি প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ কথা সত্য বটে। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পরে তার কথা লোকে একেবারেই ভুলে যায়। তিনি নড়াইলের কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে থাকেন। এখানে ওখানে কিছু ছবি এঁকেছেন। শিশুদের আঁকার তালিম দিয়েছেন। গাঁজা চরস টেনে তার দিন কেটে যাচ্ছিল। ১৯৭৬ সালে দেশে আসার

প্রায় ত্রিশ বছর পর শিল্পকলা একাডেমীতে সুলতানের একটি চিত্র প্রদর্শনী হয় এবং এতে পাঁচশর মতো ছবি স্থান পেয়েছিল।

আমাদের দেশের শিল্পী এবং চিত্র অনুরাগী মহল সুলতানের এই অমর চিত্র সমূহের প্রতি কোনো অনুরাগ দেখাতে পারল না- এ ঘটনাটা আমাকে ভয়ংকর রকম ব্যথিত করে। এই শহরবাসী মানুষদের এই নীরব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সুলতানের প্রতিভা যথাযথভাবে দেশের মানুষদের সামনে তুলে ধরার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হয়। আমি পেশাদার চিত্রসমালোচক ছিলাম না; শিল্পেও আমার কোনো রকমের অধিকার বোধ ছিল না। প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও সুলতানের উপর দীর্ঘ প্রবন্ধটি আমি রচনা করি। এ লেখায় সুলতানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের একজন হিসাবে চিহ্নিত করার কারণে আমাদের দেশের ছবি আঁকিয়েদের কাছ থেকে অনেক খারাপ কথা শুনতে হয়েছে। এটা গেল এক দিক। আরো একটা দিক রয়েছে। এ রচনাটি প্রকাশিত হবার পর শিল্পী সুলতানকে নতুনভাবে বিচার করার একটা প্রক্রিয়াও এখানে শুরু হয়। মূলত আমার রচনার বিশ্লেষণধারা অনুসরণ করে তরুণ চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ সুলতানের জীবন অবলম্বন করে 'আদম সুরাত' শিরোনামে একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করেন। দেশের একজন প্রথিতযশা কথাশিল্পী হাসনাত আবদুল হাই 'সুলতান' উপন্যাসটি লিখেন। সুলতানকে ঘিরে এক ব্যাপক কর্মতৎপরতার সূচনা হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই একটি জীবন্ত কিংবদন্তী হিসেবে সুলতানের নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাকে রাষ্ট্রীয় শিল্পীর মর্যাদা দেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানও তাকে দেখানো হয়। অনেকগুলো দেশ থেকে চিত্র প্রদর্শনী

করার আমন্ত্রণ আসে। সুলতানের অসুস্থতার কারণে কোথাও যাওয়া সম্ভব হয়নি। তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জার্মানিতে তার নামে একটি মিলনায়তনের নামকরণ করা হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছে যে সুলতানের জন্মস্থান নড়াইলে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে সরকার দেড় কোটি টাকা অনুদান বরাদ্দ করেছে। আমার ধারণা সুলতান সম্পর্কিত লেখাটি প্রকাশিত না হলে আমাদের দেশ ও পৃথিবীর সামনে সুলতানের এই নতুন পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হতো না। সুলতান একজন মহান শিল্প ব্যক্তিত্ব, তবু আমার একটা বিশ্বাস জন্মেছে, হয়তো এ প্রবন্ধটি না লিখলে সুলতানের পরিচয়টি এমনভাবে ঝালিয়ে তোলা সম্ভব হতো না।

এ লেখার শুরুতে বলেছিলাম নাম প্রবন্ধ বাঙালি মুসলমানের মনের উপর আরো কিছু কথাবার্তা বলব। আমি বাঙালি মুসলমান সমাজের সৃষ্টিকর্ম বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, বাঙালি মুসলমান রচিত কোনো শৈল্পিক এবং দার্শনিক সৃষ্টি কোনোরকম তাৎপর্য দাবি করতে পারে না। তার কারণ, এই সমাজ বাইরের দিক দিয়ে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাপে চাপে বাধ্য হয়ে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হলেও তার কৌম সমাজের মনের গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বাঙালি মুসলমানের সমষ্টিগত মনের প্রসারহীনতার একটি মুখ্য কারণই আমি নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি। শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমান সমাজ রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত ছিল না বলেই তার মনের ধরনধারণটি অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের মতো থেকে গেছে। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাই তার জাগতিক অগ্রগতির উৎস। বাঙালি মুসলমান চিন্তাই করতে শেখেনি। তার কারণ, কখনো সে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করার অধিকার

পায়নি। একটি রাষ্ট্রগঠনের মাধ্যমে একটি সমাজ বিশ্ব সমাজের অংশে পরিণত হয় এবং বিশ্বসভায় একটি আসন অধিকার করে।

বাঙালি মুসলমানের উল্লেখ করার মতো কোনো কীর্তি ছিল না। কিন্তু বাঙালি মুসলমান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এটাই তার সবচাইতে বড় এবং অবিস্মরণীয় কীর্তি। এ কীর্তির পাশে অন্যবিধ কীর্তিগুলো ম্লান হয়ে যায়। এখানে একটা কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে। আমি বাঙালি মুসলমান বাঙালির জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে এই কথাটি। বলে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাবি খারিজ করিনি। বাংলাদেশে সংখ্যাধিক মানুষ মুসলমান এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য সে কথাটি মনে রেখে বলেছি বাঙালি মুসলমান একটি বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি এই জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা পালন করেনি সে কথা আদৌ সত্য নয়।

ইতিহাসে বিশ-ত্রিশ বছর কোনো দীর্ঘ সময় নয়। বাঙালি মুসলমান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র যন্ত্রটি প্রতিষ্ঠা করেছে সে রাষ্ট্রের সংকটের অন্ত নেই, কোথাও কোনো দিক-নির্দেশনার চিহ্ন পরিদৃশ্যমান নয়। সামাজিক সভ্যে এবং ধর্মীয় কুসংস্কার সাম্প্রতিককালে এমন প্রচণ্ড আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, অনেক সময় মনে হয় এই জাতি মেরুদণ্ডের উপর থিতু হয়ে কোনোদিন দাঁড়াতে পারবে না। মধ্যযুগীয় ভূত এই জাতিকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তার নাগপাশ কখন কিভাবে ছাড়াতে পারবে একথা এখন একরকম চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান অস্থিরতা এবং মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বদ্ধমতের পুনরুত্থানের একটি কারণ আমি নির্দেশ করতে চাই। শুরু থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে দলটি গিয়েছিল তার আদর্শিক বৃত্তটি বিশ্লেষণ করলেই সেটি ধরা পড়বে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে। অন্যান্য দলও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। সুতরাং একথা বলা একটুকুও অযৌক্তিক হবে না যে, মূলত আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের একটা অংশ। পাকিস্তানের সঙ্গে বাস করে তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারছিল না বলে আওয়ামী লীগকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূচনা করতে হয়েছিল।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তাৎপর্যের দিক দিয়ে দুটি এক জিনিস নয়। এই আওয়ামী লীগের আন্দোলন যতই বেগ এবং আবেগ সঞ্চয় করেছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু সমাজের ভেতর তারা কোনো নতুন মূল্য চিন্তার জন্ম দিতে পারেনি; নতুন সংস্কৃতি নির্মাণ করতে পারেনি। তারা সেকুলারিজমের নীতিকে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর শেখ মুজিব সপরিবারে যখন নিহত হলেন তখন তার অনেকদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। মূলত আওয়ামী লীগই একমাত্র

দল যারা আমাদের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের উত্তাপ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং তাই তার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। মুশকিলের কথা হলো আওয়ামী লীগ যখন জেতে তখন মুষ্টিমেয় নেতা বা নেত্রীর বিজয় সূচিত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন পরাজিত হয় গোটা বাংলাদেশটাই পরাজিত হয়, আওয়ামী লীগের যারা বুদ্ধিজীবী তাদের অনেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষায় কথা বলতে জানেন না। তাদের কথা অনেক সময়ে মনে হয় ভারতের তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরা দেশের ভেতরে সেকুলারিজম আবিষ্কার করতে অক্ষম। বাইরে থেকে সেকুলারিজম আমদানি করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখানেই আমাদের জাতি এবং সমাজ জীবনের যাবতীয় বিপত্তির উৎস। মুসলিম সমাজ এবং সংস্কৃতির ভেতরে একটা সেকুলারিজম-এর ভিত প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আমাদের জনগণের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। শেষ কথা আমি এই বলতে চাই যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ধর্মীয় সংস্কারে পীড়িত মুসলিম সমাজের দিকে অত্যন্ত সাহস নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাকাতে হবে। মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামোর ভেতরে আধুনিক সমাজের বীজ রোপণ করে প্রাচীন সমাজ কাঠমো ফাটিয়ে ফেলতে হবে। এই কাজটি যেদিন হবে বাঙালি এ জাতীয় রাষ্ট্রটি আপন শক্তি এবং শৌর্য নিয়ে পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রটি জন্ম দিয়েছে সেটি ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সবচাইতে আধুনিক রাষ্ট্র। এই আধুনিক রাষ্ট্রের দাবি এবং প্রয়োজনটি স্বীকার করে নিয়ে সঠিক রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা লাভ করলে বাংলাদেশ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সত্যিকারের আশ্রয়স্থল হিসেবে পৃথিবীতে গৌরবের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

বুক পয়েন্ট গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সাহসী হয়েছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। অন্য সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অন্তহীন।

আহমদ ছফা

একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশ বাহাত্তর

আজ বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাভাষী মানুষ বাহান্নর শহীদদের স্মরণ করছেন। একটি জনযুদ্ধে জয়ের আনন্দ নিয়ে, একটি নতুন সম্ভাবনাময় শোষণমুক্ত সুসভ্য সমাজ সৃজনের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত অন্তরে- একটি প্রবল, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানি ফ্যাসীবাদী সেনাবাহিনীর নির্মম নৃশংস ইতিহাসের নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ডের করুণ বেদনায় আপুত বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাভাষী মানুষ- সমগ্র বাঙালি জাতি রাইফেল, কামান, মেশিনগান ধরা কড়পরা হাত, বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিসর্জিত প্রাণ শহীদদের অন স্মৃতির প্রতি সম্মাননায় পরস্পর যুক্ত করেছেন। অপরিসীম স্পর্ধা বিনয়ে প্রশান্ত করেছেন, গর্বিত মস্তক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় অবনত করেছেন। জয় হোক বাংলাভাষার, জয় হোক বাংলাভাষীর । জয়ী হোক বাংলাভাষার অপরূপ গতিভঙ্গিমা, জয় হোক বাংলার লক্ষ স্বাধীনতাপ্রেমিক শহীদের অন্তরের অনিভন্ত কামনা।

আটই ফাল্গুন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ের, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পথে রক্তলাল তোরণদ্বার। আমাদের জাতির অন্তরে সঞ্চিত অগ্নিপ্রভ স্বদেশপ্রেমের প্রখর জ্বালামুখ, আমাদের জাতীয় অন্তরে সঞ্চিত অমৃতধারার সংলাপিত ঝরনা। বিগত বিশ বছর ধরে প্রতিটি বছর এই দিনে আমরা সবান্ধবে সমবেত হয়ে এই দিনটির জ্বলন্ত সূর্যের কাছে কায়মনোবাক্যে উজ্জ্বল জীবনের, সুন্দর জীবনের বর প্রার্থনা করেছি। অত্যাচারী শাসকের রক্ত চোখের কুটিল-দৃষ্টি এবং কুটির রেখা দেখে আমরা

ভীত হইনি, সন্ত্রস্ত হইনি। অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনাগঞ্জনার চণ্ডাল রাজত্বে বাস করেও আমরা এই দিনটিতে অত্যন্ত প্রসন্নভাবে উদার মন এবং বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের হয়ে, বাংলাভাষার সমস্ত মানুষের হয়ে বড় কিছু মূল্যবান কিছু, জীবনের মতো প্রিয় সূর্যের মতো জ্বলন্ত কিছুর কামনা করেছি। গোটা বছর আমরা মূক পশুর জীবনযাপন করেছি, মানুষী প্রেরণার প্রমিথিয়ান শিখায় দগ্ধ হয়েছে আমাদের অন্তর্লোক, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব। প্রতি বছর এই দিনটিতে আমাদের অন্তরের অবরুদ্ধ কামনা ময়ূরের মতো কলাপিত হয়ে উঠেছে, ক্ষোভ বজ্র নিমেষে ফেটে পড়েছে, আনন্দধারা দিগন্তরেখার ধারে ধারে অভিসার করেছে। আমাদের কবিতার প্রতীক চিত্রকল্প আকাশের নক্ষত্রমালার মতো জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটেছে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দোলায়িত ধানের সবুজ শীষের মতো দুলেছে, ডগায় ডগায় হাওয়া লাগা কচি পাটের চারার মতো আন্দোলিত হয়েছে। নারকীয় ষড়যন্ত্র এবং পৈশাচিক নির্যাতনের মধ্যে বাস করেও এই দিনটিতে আমরা বাংলাভাষার স্বাধীনতার দাবিতে বিসর্জিত প্রাণ শহীদদের ত্যাগের বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ হিসেবে কথা কয়েছি, গান গেয়েছি, বেদনার্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছি। আমাদের শ্রম কল্পনা ও সংঘ শক্তির উপর ভরসা করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সমস্ত পৃথিবীর প্রতি মৈত্রীদৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছি। এই দিনটিতে আমরা উৎসবের আসর জমিয়েছি। আদ্যিকালের প্রাগৈতিহাসিক চেতনা থেকে উৎসারিত আদিমতার ছাপ আঁকা যুথবদ্ধ উৎসব নয়। এই উৎসবের দিনের স্রষ্টা আমরা নিজেরাই, আমাদের সুসভ্য মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার তীক্ষ্ণ তাগিদ থেকে, আমাদের তরুণের লাল খুন থেকে উঠে এসেছে এই উৎসব আমাদের জনজীবনে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আমরা গাঢ় গভীর স্বরে শপথের

বাণী উচ্চারণ করেছি, ধৈর্যের সঙ্গে শক্তি সঞ্চয়ের প্রেরণা নিয়েছি, আঘাত খেয়েও আঘাত করার প্রচণ্ড স্পর্ধা বুকে লালন করেছি। জল যে পথে যায় রক্ত সে পথে যায় না, কেননা রক্ত জলের চাইতে গাঢ় এবং ঘন। আমরা শহীদের রক্তের উপর আস্থা স্থাপন করেছি, প্রতি বছর সে আস্থা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে। বাহান্নর রক্ত গোটা জাতিকে আরো রক্তদানের পথে ধাবিত করেছে। বাহান্নর উৎসর্গিত প্রাণ আরো প্রাণকে উৎসর্গের পথে ডেকে নিয়ে গেছে। সে প্রাণের সীমা নেই, সংখ্যা নেই। ভেদ নেই স্ত্রী পুরুষ, জাত নেই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান। বয়স নেই আতুর ঘরের শিশু, থুথুরে বুড়ো, শ্যামল বটের মতো উঠতি বয়সের তরুণ যুবা। বাহান্ন থেকে বাহাত্তর আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষের রক্ত সূত্রটি পাহাড়িয়া নদীর মতো বেঁকে বেঁকে এগিয়ে এসেছে, রক্তে আরো রক্ত মিশেছে, প্রবাহ খরতর হয়েছে, তাতে তরঙ্গ ভেঙেছে, জোয়ার ফুলেছে, নামহারা বাংলাদেশের মানুষের ধমনীর নিঃসরিত খুনে মেঘনার স্রোত বয়েছে। এই রক্তের দরিয়ার উপকূলে আভাসিত হয়েছে বিগত বিশ বছরের প্রতিটি ফাল্গুনের উন্মথিত আকাক্ষা, উজাগর চেতনার স্বরূপ স্বাধীন স্বদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা আমাদের কল্পনার রত্নভাণ্ডার, স্বপ্নের মুকুল, চিন্তার চিত্রশালা, আবেগ প্রবাহের মধুভাণ্ড, গোপন বেদনার চিনাংশুকের শাড়ি,বাংলাভাষার স্বাধীনতা সংগ্রামে বিসর্জিতপ্রাণ শহীদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি পুস্পাঞ্জলি প্রদান করছি। আমরা শহীদের রক্তে আস্থা স্থাপন করে ভুল করিনি। শহীদের রক্ত আমাদেরকে সঠিক পথেই পরিচালিত করেছে। শুধু আমরা নই, ওপার বাংলায় আমাদের ভাষার ভাই এবং সংস্কৃতির অঙ্গজ সন্তান বঙ্গবাসী এবং বঙ্গভাসী জনগণ ইতিহাসে অভূতপূর্ব বাঙালিজাতির একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দিনে, ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মৃতি তর্পণ করছেন। আমরা পশ্চিম বাংলার

ভাইদের প্রতি আজ বহুদিনের অর্গলবদ্ধ প্রীতি এবং সম্প্রীতির দুয়ার উন্মুক্ত করব। বাংলাভাষাভাষী জগতে অমর হোক, শহীদের স্মৃতি অক্ষয় হোক। বাঙালির কাব্যলোক, গল্পলোক, কল্পলোক, সঙ্গীত লোক এবং সাহিত্য সৃজনকে প্রাণের মুক্তি পিপাসা, জীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসা, সুর-তান লয়ে রূপে রসে ছন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

উনিশশ বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নিজেদের ভেতরের ব্যাপার নিয়ে এত বেশি মগ্ন থাকতে হয়েছে যে, আমাদের ভাষা আন্দোলনের যে একটা আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আছে সেদিকে তাকিয়ে দেখার মতো সুস্থির চিত্ত কখনো হতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভাষাদীন' জাতি তার ভাষায় কথা বলতে পারে না, কারণ তাকে সব সময় একটা না একটা শক্তিশালী জাতির ভাষায় কথা বলতে হয়, কাজ কারবার চালাতে হয়, মনের ভাব প্রকাশের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে হয় । এটা কোনো জাতি শখ করে করে না, বাধ্য হয়েই করে। আফ্রিকা এশিয়ার দেশগুলিতে ইংরেজি, ফ্রেন্স, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাসমূহের যে প্রসার ঘটেছে তার মূলে যতটা জবরদস্তি, তার ছটাক পরিমাণও জ্ঞান কিংবা সৌন্দর্যপ্রীতি নেই । যুগে যুগে আমরা দেখেছি বিজয়ী বিজিত জাতির কাঁধে তার ভাষা শিক্ষার দায় চাপিয়ে দিয়েছে। চিরায়ত সাম্রাজ্যবাদের যুগ এখন অবসিত। কিন্তু পচা আদার ঝাঁঝের মতো ভাষার সাম্রাজ্যবাদী ভঙ্গি এখন কোথাও কোথাও নাক উঁচিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো দেশে কেবল সংখ্যাধিক্যের জোরে কোনো কোনো ভাষা সংখ্যালঘু ভাষাগুলো গ্রাস করার জন্য হাঙরের মতো মুখ ব্যাদান করছে। বাংলাদেশের আন্দোলনের ফলে দুটো বিষয়ই পরিষ্কার

হয়েছে। একটি হলো, একটি জাতির ভাষা যতই অসমৃদ্ধ হোক না কেন দৃঢ়ভাবে ইচ্ছে করলে এ ভাষার সাহায্যেই জাতি কাজ কারবার চালাতে পারে এবং গভীর নিষ্ঠায় জাতির সামগ্রিক সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করলে ঐ ভাষাকেই সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে বিকশিত করে তোলা সম্ভব । অন্যটি একটি দেশের অভ্যন্তরে একটি ভাষা, রাষ্ট্র শক্তির আনুকূল্যে প্রবল হয়ে অন্যান্য ভাষাগুলোর প্রাণশক্তি রুদ্ধ করে ফেলে, আস্তে আস্তে তখন ভাষাগত সংখ্যালঘু 'ভাষাদীন' হয়ে দাঁড়ায়। ডারুইনের মতে, ব্যবহারের অভাবে মানুষের লেজ খসে গেছে, তেমনি ব্যবহারের অভাবে ভাষার প্রাণশক্তি থিতিয়ে আসবে তা বিচিত্র কি। একটি ভাষার বিকাশ রুদ্ধ করে একটা জাতিকে চিরকালের জন্য বামুন করে রাখা সম্ভব। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এই 'ভাষাদীন' মানুষদের হাতে একটা শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আমাদের আশপাশের দেশসমূহে যে তার প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে বিগত কয়েক বছরের ঘটনাতেই তার প্রমাণ মেলে। উনিশশ বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন প্রমাণ করেছে, বুকের রক্ত ঢেলে মুখের ভাষার ইজ্জত রক্ষা করার হিম্মত থাকলে যে কেউ ঐ ভাষাকে আশ্রয় করেই জগতে নিজের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারে।

উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি আমলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার স্বীকৃতি মিলেছে। সেটা কি সত্যিকারের স্বীকৃতি? প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ উপনিবেশবাদের মতো ভাষারও সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং উপনিবেশবাদ রয়েছে। পাকিস্তানি আমলে বাংলাভাষা কখনো গণতান্ত্রিক মর্যাদা লাভ করেনি। সমুদ্রের জল থেকে যেমন নীলকে হেঁকে আলাদা করা যায় না, তেমনি একটি জনগোষ্ঠীর থেকে তার ভাষাকেও আলাদা করা অসম্ভব। একটি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, জলহাওয়া, মৃত্তিকা, নদনদী, কল্পকথা, রূপকথা

কত কিছুর মধ্যে শিকড়িত একটি ভাষা। বটবৃক্ষের মূল ঝুরি কেটে কাণ্ড এবং ডালপালাকে যদি বটবৃক্ষ বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে পাকিস্তানি আমলের বাংলাও মূলহীন ডালপালাসর্বস্ব রাষ্ট্রভাষাই ছিল। আমরা কি বাংলা ভাষায় বাঙালি ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করতে পেরেছি? আমরা কি বাঙালির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য, শৈল্পিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের সাধনার সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি? আমরা কি নির্ভাবনায় বাঙালি মনীষীদের রচনা পড়তে পেরেছি? না স্বাধীনভাবে বিচার করতে পেরেছি? আমরা কি বাংলাভাষায় একখানি বই লিখে জীবনবিরোধী ধর্মীয় জাড্য কুসংস্কারের মরচেয় প্রচণ্ড আঘাত করে বাঙালি জাতির সংস্কার মুক্তি সাধন করতে পেরেছি? আমরা কি একখানি বই লিখে বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের জীবনের চারপাশ ঘিরে যে ষড়যন্ত্রের জাল, তা কি মুক্ত আলোকে দৃশ্যমান করে তুলতে পেরেছি? আমরা কি বহতা নদীর মতো সৃষ্টিশীলতার আমেজবাহী একখানা সাময়িকপত্র দীর্ঘদিন ধরে চালাতে পেরেছি? এসব কিছুই আমরা পারিনি। তবু বাংলা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানি সংস্কৃতির প্রবক্তাবৃন্দ, যারা ইকবালকে চালু করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বদলে, সুসভ্য মানুষের জন্য দোভাষী পুঁথি আমদানি করেছেন, জঙ্গিলাট আয়ুব খা-ও কবিতার রসিক একথা অপরকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন, মহাপুরুষ, আদমজী-দাউদেরা সাহিত্যের সমঝদার এ কথা ভুল করে ঠিক ঠাউরেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। পুষ্প চন্দন বর্ষিত হোক শিরে, তাদের পদোন্নতি ঘটুক সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে। তারা বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর খোঁচাখুচি করেছেন এবং সাফল্যজনকভাবে অনেকগুলো চক্র উপচক্রের জন্ম দিতে পেরেছেন দয়া করে তারা বিশ্রাম করুন । আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। বাঙালি সংস্কৃতিকে ক্ষমা করে

সত্যি মহত্ত্বের পরিচয় দেবেন, রক্তস্নাত বাঙালি জাতি এটা স্বাভাবিকভাবেই আশা করে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, যদি অসুবিধা না হয় আমাদের সংস্কৃতির প্রাক্তন মুরুব্বিদের কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে থাকলে তাদের ক্লান্ত মস্তকগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। যাবজ্জীবন ধরে সাম্প্রদায়িকতার বেসাতি করে যাদের নাম ধাম খ্যাতি এবং পদোন্নতি, তারা যদি পুরনো আসনগুলোতে নড়ে চড়ে ফের বসেন তাহলে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভরাডুবি হবে।

বাংলাদেশে একটি নতুন রেনেসাঁর সূত্রপাত হতে চলেছে। চারিদ্র্যের দিক দিয়ে উনিশ শতকের কলকাতা শহরকেন্দ্রিক বাংলার যে প্রাণজাগরণ তার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। বস্তুত সকল রেনেসাঁর মধ্যে একটা ভাবগত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় । মানুষের মানুষী অস্তিত্বের নতুন মূল্যায়ন; ধর্মীয় সামাজিক ইতিনেতি সকল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে জীবনের প্রকৃত সংজ্ঞায়নই হলো রেনেসাঁর মূল বৈশিষ্ট্য। সূর্যের নিচে মানুষের সমাজের প্রকৃত স্থান কোথায় শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের নিরিখে আবিষ্কার করে মানুষের চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধন করাই রেনেসাঁর কাজ। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধকারে সংলপ্ত ইউরোপে এমনটি ঘটেছে। এমনটি ঘটেছে উনিশ শতকের বাংলায়। বৃক্ষ সমাজের মতো অনড় অটল বাঙালি সমাজ থেকেই বেরিয়ে এল প্রতিভার মিছিল। বেরিয়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন ধরনের মানুষ। বুকে বিদ্রোহের ধিকিধিকি আগুন, চোখে নতুন আকাক্ষার ঝলকানি, মাথায় নতুন একটি জগৎ সৃজনের পরিকল্পনা। এখন আমরা যে সময়টিকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে থাকি রেনেসাঁর প্রেরণায় তার আঁশ শাষ পুষ্ট, হৃৎপিণ্ড ধমনীতে ছন্দায়মান নতুন জীবনবোধের প্রেরণা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ জগতের শুদ্ধভাবের বিকাশের ক্ষেত্রে, পশু মানুষকে বোধসম্পন্ন উন্নত দেবধর্মী মানুষ হিসেবে রূপায়ণে, জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টিতে, শিল্পকলার লাবণ্য সঞ্চারের মধ্য দিয়ে যন্ত্রবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় উৎকর্ষ সাধনে, শিল্পবিপ্লবে, সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিসমূহের রাজ্য বিস্তার, পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এশীয় দেশের সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিপ্লবে অনেক কিছুই দান করেছে। উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁ অন্তত কতিপয় বাঙালি মনের সংস্কার মুক্তি সাধন করেছে। তথাকথিত প্রাচ্য দর্শনের বর্বর অন্ধকার ঠাসা মনকে বাংলার কতিপয় মানুষ উনিশ শতকের শুরু থেকেই জ্ঞানের প্রখর সূর্যের আলোর দিকে ফিরিয়েছিলেন। তার কথা শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাঙালির কাছে নতুন করে বলে লাভ নেই। বাঙালি ধর্মীয় মোহ ছেড়ে সাহিত্য সৃজনে মন দিল। সে সাহিত্য কালের কণ্ঠে ইন্দ্রমনির হারের মতো অনেকদিন দুলবে । বাঙালি কালাপানির সীমানা ডিঙিয়ে গেল। বাঙালি বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকল, বাঙালি নতুন সমাজ রচনায় ব্রতী হলো, নতুন রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনের জন্য শক্তি নিয়োগ করল । আজকের বাংলা কেন, স্থূল অর্থে সমগ্র ভারতে যা হয়েছে তা উনিশ শতকের বাংলার, রেনেসাঁসের প্রেরণা থেকেই সম্ভাবিত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি প্রতিশ্রুতিবান সকালের তেজীয়ান সূর্য যেমন অপরাহে ক্লান্ত ছায়া মেলে দেয়, তেমনি প্রতিটি রেনেসাঁর আলোকতরঙ্গও নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অন্ধকারের সাগরে অবগাহন করে । রেনেসাঁর মূলমন্ত্র জ্ঞানই শক্তি বিকশিত হওয়াই জ্ঞানের ধর্ম। কিন্তু ধর্মীয়, সামাজিক, শ্রেণীগত, জাতিগত অহংবোধে পীড়িত মানব সমাজ জ্ঞানকে সেবাদাসী করতে গিয়ে নিজের সমাধি রচনা করেছে। আলোকিত গ্রিসকে দাসভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা হত্যা

করেছে, সুসভ্য ইউরোপকে ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা কোণঠাসা করে এনেছে। উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের প্রাণসম্পদ এবং ভাবসম্পদ এখন অবসিত হয়ে এসেছে। আমরা আজ উনিশশ বাহাত্তর সালের শুরুতে দাঁড়িয়ে এ কথা যদি বলি, আশা করি অন্যায় করব না।

বাংলাদেশে যে একটি নতুন রেনেসাঁ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অনেকদূর। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিপূর্ণ এবং সুবলয়িত। কেননা উনিশ শতকের রেনেসবোধের বিকাশ হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের লৌহ কাঠামোর অভ্যন্তরে । সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কখনো চায়নি সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হোক। তাই উনিশ শতকী রেনেসাঁ অনেকগুলো বিশ্ববিশ্রুত মনীষার সৃষ্টি করলেও সমাজের সাধারণ মানুষকে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষকে জ্ঞানের ভোজে আমন্ত্রণ জানায়নি এবং সুন্দর জীবনবোধে উদ্দীপিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে নবজাগরণের যে ক্ষেত্র আভাসিত হয়েছে তাতে কোনো বিধি-নিষেধের বালাই নেই। বাংলাদেশের গণসংগ্রামের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়, জ্ঞান সমাজের সকল মানুষের জন্য এবং সকল মানুষের সুন্দরের বোধে উদ্দীপিত হওয়ার অধিকার জন্মগত। বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের মানুষ গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, সুন্দর উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ মানবসমাজ সৃজন এবং নতুন একটি দীপ্ত ধারার সভ্যতা নির্মাণ করার জন্য নিজের যা কিছু মূল্যবান বিসর্জন দিতে পারে।

বাংলাদেশের গণসংগ্রামকে কেউ কেউ বলেছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রম সংশোধন, কেউ কেউ বলেছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর । এসবের কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা সে বিষয়ে আলোচনা না করেও একটি কথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়, ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালি জাতি নিজে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিল, ইতিহাসে বাংলা ভাষা এই প্রথম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেল। এটা আপনি আপনি ঘটেনি। যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে স্মরণকালের ইতিহাসে তার জুড়ি নেই। এজন্য বাংলার প্রতিটি মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণেই গর্ববোধ করতে পারে। এই গর্ববোধই বাংলাদেশে নবযুগ এবং নবজাগরণের গতি-প্রকৃতি বেগ আবেগ সঞ্চার করবে। এ ফাঁকা আশাবাদ নয়। কিংবা উগ্র জাতীয়তাবাদও নয়। ইতিপূর্বে লড়য়ে হিসেবে বাঙালিরা সুদক্ষ এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কোনো সুযোগ-সুবিধা জাতি হিসেবে পায়নি। যখনই প্রয়োজন বাধ্য করেছে তাদেরকে, বলতে গেলে খালি হাতেই লড়াই করতে হয়েছে এশিয়ার একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর সঙ্গে। বন্ধু দেশগুলো সাহায্য করেছেন, তাদের ধন্যবাদ। কিন্তু একটি সমগ্র জাতির স্বাধীনতার জন্য, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মরণের এই যে সরল এবং বীরত্বব্যঞ্জক প্রস্তুতি তা না থাকলে কোনো সাহায্যই কাজে আসত না। প্রয়োজনের তাগিদেই বাঙালিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস দর্শনেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতেই হবে। এ কঠিন কাজ। কিন্তু নতুন ইতিহাস সৃজনের কোনো সহজ পন্থা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আগে অভাব যে পরিমাণে বোধ করেছি এখন তা একশ গুণ বেশি তীব্রভাবে অনুভব করছি। কারণ দাসজাতির অভাব অল্প, তার ক্ষমতাও অল্প। আমরা আমাদের ক্ষমতা উপলব্ধি করেছি এবং অভাবটাও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করছি। গলদ কোথায় ধরতে পারছি। আগে

আমরা কিসে আমাদের মঙ্গল এবং কিসে আমাদের অমঙ্গল ভাবতে পারতাম না। এখন সে বাধা অপসারিত। তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসন একটা দুঃস্বপ্ন। এখন থেকে সচেতনভাবে, সক্রিয়ভাবে আমাদের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করতে পারব এবং অপরকে নিজের কল্যাণ ভাবনায় ভাবিত করে তোলার পথে কেউ বাধা দিতে হইচই করে ছুটে আসবে না। অন্য দশটি স্বাধীন সমৃদ্ধিশালী জাতির মতো আমরাও মাথা তুলে দাঁড়াবো। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, প্রযুক্তিবিদ্যা কোনো দিকে কোনো জাতির চাইতে পিছিয়ে থাকব না। আমরা সমাজ এবং সমাজ আদর্শকে নতুনভাবে ঢালাই করব- যেমনটি আমাদের মন চায়, সাধ্যে কুলায়। জীবনবিরোধী সমাজবিরোধী সকল অন্ধ তামসিক শক্তির বিরুদ্ধে আমরা ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমরা কারো মতো হব না, আমরা আমাদের মতো হব। আমরা কারো

অনুকরণ করব না, নিজেদের সৃষ্টিশক্তি বিকশিত করে তুলব। আমরা আমাদের মতো করে কাব্য লিখব, সাহিত্য করব, ইতিহাস সাধনা করব, দর্শন চর্চা করব, বিজ্ঞানের চর্চায় মন দেব। এক কথায় পৃথিবীর সমাজ বিপ্লবগুলোর এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসের সারাৎসার মন্থন করে, প্রয়োজনীয় শ্রম, ত্যাগ এবং তিতিক্ষা সয়ে সবকিছু সম্মিলিত জীবনধারার অনুকূল করে গড়ে তুলব। মেঘনা পদ্মা-বিধৌত এই পাললিক ভূমিতে বাংলার সংস্কৃতি বাঙালির ঐতিহ্যে নতুন রক্ত মুকুল মেলবে। এই বাংলাদেশে বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার ফসল আকাশ স্পর্শ করবে। সত্য ভাবার, সত্য বলার এবং সত্য আবিষ্কার করার কত বলিষ্ঠ চিত্তের প্রয়োজন আজ সব চাইতে বেশি। মিথ্যার সঙ্গে যারা আপোস করে কথায় কথায়, তাদের দিয়ে একটি জাতির মোড় ফেরানো যায় না।

আমাদের জ্ঞানী-গুণী এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলী পরম নির্ভয়ে সত্য আবিষ্কারে স্বাধীনভাবে মন দিলে তাদের সাধনার মধ্য থেকেই জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। আজকে মনের সে স্বাধীনতা চাই এবং চাই সে সাহসিকতা। দাসসুলভ মনোবৃত্তি দিয়ে কখনো একটি স্বাধীন জাতির চিত্তবৃত্তিতে বেগ জাগানো যায় না। প্রকৃত মানসিক স্বাধীনতা এবং দুর্মর সত্য অন্বেষাই বাঙালির প্রতিটি ভাবুককে ভাবিত করুক, প্রতিটি কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে তাড়িত করুক। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভাষা আন্দোলনের শহীদদের অম্লান স্মৃতি বুকে নিয়ে এটাই কামনা করছি।

আমাদের নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র । গণতন্ত্রের দাবিতে উপনিবেশবাদী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমরা গত তেইশ বছর ধরে কঠোর কঠিন মরণপণ সংগ্রাম করে আসছি। সমাজতন্ত্র আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীভূত করার প্রাগ্রসর দাবি। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সভ্য মানুষ হিসেবে বসবাস করার প্রাথমিক অভিজ্ঞানপত্র। এগুলো বাইরের কোনো দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। আমাদের সামাজিক জীবনের বাস্তব দাবি থেকেই এগুলোর উৎপত্তি। যারা সমাজতন্ত্রের জন্য লিখবেন, ভাববেন, যারা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইবেন এবং যারা সাম্প্রদায়িকতার রূপ ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটিত করে সুন্দর সুসভ্য মানুষদের একটি সমাজ এই বাংলাদেশে কায়েম করার জন্য সমস্ত মানুষের হয়ে চিন্তা করবেন তাদের সে স্বাধীনতা যেন থাকে। এই গ্যারান্টি আমরা আজ সরকারের নিকট নিশ্চিতভাবে চাই, এই অধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা মনে করছি যে যুগের অবসান হয়েছে যখন আবদুল মোনেম খানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ধমক

দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং গীতাঞ্জলী রচনার নির্দেশ দিতেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে একটি অসভ্য, অন্ধকার যুগের অবসানকালে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজনের বিয়োগ বেদনা বুকে নিয়ে আজ জয়ধ্বনি করছি।

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নব যুগ ঐ এল ঐ

সমস্ত বর্বর চেতনা, চিন্তা এবং অশালীন মনোবৃত্তির অবসান হোক।

বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে

'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী বাঁচিবে না'

এই মন্তব্য করেছিলেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তেমন একখানি ইতিহাস লেখা তারও পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। বাধা ছিল অনেক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক। এ চতুর্মুখী আক্রমণের মুখে বাঙালির ঠিকুজী কুলজী আবিষ্কার করে জনসমক্ষে তুলে ধরা অসম্ভব ছিল । আজকের দিনে বাঙালি সমাজের কোলঘেঁষা আত্ম-অপরিচিতির অন্ধকার অনেকটা কেটেছে, সংস্কারের জটাজালের নাগপাশ অনেক বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। বাঙালি জনগণের মন এমন অনেক ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক সত্য নির্বিবাদে মেনে নিতে রাজি হয়েছে, আগের দিনে এসব কথা শুনে বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাও ভিরমি খেয়ে যেতেন। মন তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ইতিহাসটি এখন স্বপ্নই থেকে গেছে। তথ্যের সমাবেশ করা সম্ভব, ঘটনা বর্ণনা করা যায়, রাজা-রাজড়ার নামের তালিকা দেয়া যায়। সীমিত পরিসরে অর্থনীতি সমাজনীতি শিল্প সাহিত্যের উপর ভাসা-ভাসা আলোচনা-তাও করা যায় না এমন নয়। একটি গ্রন্থ-এর সবকিছুকে কোল দিয়ে ফুলে উঠতে পারে। কিন্তু ইতিহাস হয়ে উঠবে না।

বলা হয়ে থাকে, মানুষই মানুষের ইতিহাস। এবং মানুষই মানুষের ইতিহাসের নির্মাতা। ইতিহাসে এই মানুষের পরিচয় থাকা চাই। বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর মানুষেরই একটা

ভগ্নাংশ। সুতরাং বিশ্বমানবতার অগ্রগতি এবং আত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের মানুষও। বাঙালিকে শুধু বাংলাদেশের জারুল, গর্জন, শাল আদি বৃক্ষের মতো সৃষ্টিশীলতাবর্জিত জাতি হিসেবে বিচার করা ঐতিহাসিক সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। আবার বিদেশী বিজাতির আরোপিত ধর্ম সংস্কৃতি বয়ে বেড়াবার ধোপার গাধা হিসেবে বাঙালিকে বিচার করাও ঐতিহাসিক সত্যের ঘোর অপলাপ। বাঙালির ইতিহাস চর্চা কখনো সহজ এবং স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হতে পারেনি। এখানে সেখানে এক আধটু প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র। ইতিহাসকারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা আপনাপন যুগচেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। না হয় দু-একজন দু-এক পা এগিয়েছিলেন। এখানে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি উক্তি স্মর্তব্য, 'বাঙ্গালী গড়ে ওঠেনি, ঢালাই হয়েছে'। বাঙালি সমাজের কোন অংশ ঢালাই হয়েছে সে বিষয়ে চৌধুরী মহাশয় অধিক কিছু না বললেও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধরে নেয়া যায়, বিভিন্ন সময়ে রাজশক্তির আনুকূল্য করেছে যে সকল শ্রেণী তারাই ঢালাই হয়েছে, বাংলাদেশের আসল মানুষের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। এই ঢালাই হওয়া মানুষরাই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজের সংস্কৃতিতে লাবণ্যের সঞ্চার করেছেন। বাঙালি মনের পরিধি বিস্তৃত করেছেন। বাংলার ইতিহাসও লিখেছেন তারাই। তার ফলে দেখা যাবে ইতিহাসে ঢালাই হওয়া মানুষদের রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের সমাজের চলিষ্ণুতা যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে বলতে হয় ইতিহাস শুধু অতীত ঘটনা কিংবা সাল তারিখ তাম্রলিপি বা শিলালিপির সমাহার নয়। যে মানুষ বর্তমানে বেঁচে আছে, ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে, অতীত তাদের কেমন ছিল তার আসল প্রেক্ষিত তুলে ধরাই ইতিহাস।

ভবিষ্যতের একটা বাস্তব পরিকল্পনা না থাকলে প্রকৃত অতীত রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। কেননা প্রকৃত অতীতের উপরই সত্যিকারের ভবিষ্যতের ভিত্তি।

আগের যুগের ইতিহাস লিখিয়েরা সাধারণ মানুষের শ্রম-চেষ্টা কল্পনা এবং ধ্যানকে কখনো ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে ধরে নেননি। তার ফলে ইতিহাস থেকে ইতিহাসের আসল উপাদান মানুষই বাদ পড়ে গেছে। তাদের এজন্য খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ একাট্টা হয়ে ইতিহাসের চেহারা পাল্টাবার জন্য নিজেদের বিক্রম এবং সংঘ শক্তির আস্থায় আস্থাবান হয়ে এগিয়ে আসেননি কখনো। ঐতিহাসিকও তো সমাজের একজন। সমাজ যদি না এগোয় ঐতিহাসিক তো আর হাওয়ায় ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে পারেন না। সাধারণ মানুষ যদি পৃথিবীতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়ে না ওঠে, তাদের অতীতকে গৌরবময়ী করে ঐতিহাসিক দেখাতে পারেন না। তাই বাঙালির স্বপ্ন এখন পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে।

বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান সংগ্রাম সে ইতিহাস লেখার সম্ভাবনাটিকে মূর্ত করে তুলেছে। কেননা এই মরণপণ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। তাদের স্বাধীনতার জন্য, সত্যের জন্য লড়তে হচ্ছে। লড়তে লড়তে, মরতে মরতে তাদের পথ পরিষ্কার করতে হচ্ছে। চরিত্রের যা কিছু মহৎ শ্রেষ্ঠ এবং সত্য তার উপর দাঁড়িয়েই তারা ফ্যাসীবাদী পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে। পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মানুষকে দাস করে রাখবার জন্য মানুষের

সমাজে জঙ্গলের আইন চালু করেছে। গত পঁচিশে মার্চ তারিখের পর থেকে সেই নৃশংস বনের আইন প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে খাঁচায় আটক রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে তারা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ পশুশক্তির দাস না থেকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুলেছেন। বস্তুত বাংলাদেশের এ সংগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক পাকিস্তানি ডাইনোসরের বিরুদ্ধে সভ্য স্বাধীনতাকামী মানুষের মানুষী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের অ্যাসিড স্পর্শে বাঙালি মানসিকতার খুব দ্রুত পালাবদল ঘটছে। পূর্বেকার সংস্কারের জের রণ রক্ত সফলতার মধ্য দিয়ে তার চেতনা থেকে বুড়ো পাতার মতো ঝরছে প্রতিদিন। আর বিশ্বের এতাবৎকালের মানব সমাজের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার সারাৎসার তার চেতনায় স্থান করে নিচ্ছে এবং নতুন মানুষ হয়ে উঠছে প্রতিদিন। যে-কোনো জাতির জন্য আদর্শবদ্ধ দুঃখের হিমশীতল স্পর্শের চাইতে মহৎ শিক্ষা আর কিছু হতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ যারা লড়াই করছেন, যারা ছিন্নমূল হয়ে শরণার্থী শিবিরে বাস করছেন সকলেই ক্ষগ্রিস্ত হয়েছেন, হবেন। অনেকে প্রিয়জন বিসর্জন দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দেবেন। বাঙালি জাতি সামগ্রিকভাবে এমন ত্যাগ এমন আত্মবিসর্জন ইতিহাসের আর কোনো পর্যায়ে করেনি। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অন্ধ বিশ্বাসের মরচে প্রচণ্ড বাস্তব আঘাতের মুখে ঝরছে এবং চরিত্রের যা সত্যিকার শক্তি তা সৃষ্টিশীলতায় বিকাশ লাভ করছে। এই লড়াই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে বাংলার ইতিহাসের ভারকেন্দ্র ঢালাই হওয়া মানুষদের সমাজ থেকে বাংলার পাললিক মৃত্তিকার আসল সন্তানদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। বাংলাদেশে যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় আসন্ন হয়ে উঠেছে তার স্থপতি বাংলার জনসাধারণ।

বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুরুষ, লেখক, শিল্পী এবং সর্বস্তরের মানুষ। সকলে অনুভব করে আসছিলেন উনিশশ বাহান্ন সাল থেকে তারাই ইতিহাসকে প্রবাহিত করে নিচ্ছেন। যতই দিন গেছে প্রতিবন্ধক প্রবল থেকে প্রবল হয়েছে এবং ইতিহাস সৃজনের প্রক্রিয়াতেও বেগ আবেগ দুই-ই এসেছে। উনসত্তর সালের আয়ুব খেদানো আন্দোলনের পর থেকে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে এ প্রতীতি জন্মেছে যে ইতিহাস সৃজনে তার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সে বোধ এখন রণক্ষেত্রে পরীক্ষিত হচ্ছে। বাংলার জনগণই বাংলাদেশ স্বাধীন করছে এবং বাংলার জনগণই তার সমাজ বিন্যাসে রূপান্তর আনবে। এই সাধারণ মানুষরাই এখন বাংলার ইতিহাসের নায়ক। অনেক পেঁচালো বিতর্ক বাংলার ইতিহাসকে ঘিরে জমে উঠেছে এবং পণ্ডিতেরা এপক্ষ বা ওপক্ষে গিয়ে যুক্তির গোছালো সুতো আউলা করেছেন, এবার সে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হবে। বাংলার ইতিহাসে আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ, মুসলমান-হিন্দু এবং ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যেকার অবদান কতটুকু নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখবার এবং বিচার করবার সুযোগ আসবে। উপমহাদেশের এই প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসীদের প্রকৃত বাঙালি পরিচয়টিও প্রোজ্জ্বলভাবে আভাসিত হবে। জগৎ-সভায় বাঙালি ভাবের ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে আসন পেয়েছে। এবার জাতি হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে। রাশিয়ান, আমেরিকান, চীনা এবং জাপানিদের মতো বাঙালিও ধ্যানসমৃদ্ধ, শক্তি প্রবুদ্ধ একটা জাতি। সে অপরের চাইতে ছোট নয় এবং অপরকে ছোট ভাবে না। এই বোধ বাঙালি সমাজে দাবানলের মতো দ্রুত সঞ্চারিত হতে লেগেছে এবং নতুন করে বেঁচে উঠছে বাঙালি। এই নবজাগৃতি তার প্রকৃত ভবিষ্যতের চিত্রলেখা রচনা করেছে। সুতরাং অতীতকে নিয়ে ভয় নেই। আর্য না হলে দোষ নেই। ইরান, তুরানী, আরবী পরিচয় দেয়া গৌরবের

পরিচয় নয়। বাংলার মাটির সাক্ষাৎ সন্তান স্বীকার করে নিয়েও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত সংকীর্ণতার বেঢপ চশমা এঁটে অতীতের পানে তাকাবার প্রয়োজন বাংলাদেশে অবসিত। বাংলার ইতিহাসে যারাই যাই করুক, কল্যাণ দৃষ্টির স্পর্শে মাননীয় অংশটুকু আপনার নিজের বলে দাবি করতে পারবে বাঙালি। এই সেই দেশ যেখানে মানুষের মুখের এলোমেলো ধ্বনিপুঞ্জ চর্যাপদের কবির সৃষ্টিশীল মাধুর্যে কবিতা হয়ে উঠেছে। ধ্যানের ধ্বনি মন্দিরে বিহারে রণিত হয়েছে, মনের অতলান্তে শান্ত আবেগ মসজিদের গম্বুজে রূপ পেয়েছে। বীর্যের ব্যঞ্জনা অসংখ্য হর্মমালার নির্মাণশৈলীতে ফুলের মতো বিকাশ লাভ করেছে, মৈত্রী ভাবনা রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির ঢলঢল লাবণিতে প্রকাশমান হয়েছে, তৃষিত জনের তৃষ্ণা দূর করার জন্য সজল দিঘি আকাশ পানে গহন কালো চোখ মেলেছে, প্রাচীন কবির প্রেম চিন্তা ঝিনুকের বুকে মুক্তোর দানার মতো শব্দে ধ্বনিত স্পন্দিত হয়েছে, দুলছে কালের কণ্ঠে ইন্দ্রমণির হার হয়ে। সুফি দরবেশের সাম্যচিন্তা গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে লোকালয়ে বিভেদের প্রাচীরে আঘাত হেনেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান মানুষের অন্তরে অন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, আধুনিক যুগের সাহিত্য যার স্পর্শে একূল ওকূল দুকূলপ্লাবী প্রমত্তা পদ্মার আকার পেয়েছে। সবকিছু বাঙালির ঐতিহ্য, সবকিছুকেই বাঙালি অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করবে। পৃথিবীর ভাবপ্রবাহ, কর্মপ্রবাহ এবং বিজ্ঞান চেতনা বাংলাদেশের চিত্ততল সিক্ত করে তুলেছে, হাতকে নিখুঁত করছে এবং বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও বস্তুঘেঁষা করছে। বাঙালি সমাজ ও বিশ্বের মানব সমাজের এক অংশ এই পরিচয় এবং বাঙালির যে একটি স্বকীয়তা রয়েছে সে পরিচিতি ও তার পেছনের কাহিনী তুলে ধরার সময় এসেছে এবং তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ।

বাংলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা

শেখ মুহম্মদ (এস. এম সুলতানের আঁকা গুরুভার নিতম্ববিশিষ্টা পীনস্তনী এসকল চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কর্মিষ্ঠা লীলাচঞ্চলা নারী, স্পর্ধিত অথচ নমনীয় সর্বক্ষণ সৃজনলীলায় মত্ত, অহল্যা পৃথিবীর প্রাণ জাগানিয়া এসকল সুঠামকান্তি কিষাণ, এসকল সুন্দর সূর্যোদয়, সুন্দর সূর্যাস্ত, রাজহাঁসের পাখনার মতো নরম তুলতুলে এসকল শুভ্র শান্ত ভোর, হিঙুলবরণ মেঘ-মেঘালীর অজস্র সম্ভার, প্রসারিত উদার আকাশ, অবারিত মাঠ গগন ললাট, তালতমাল বৃক্ষরাজির সারি, দীঘল বাকের, নদীতীরের এসকল দৃষ্টি-শোভন চর, মাঠের পর মাঠে থরে থরে ঢেউ খেলানো সোনার ধান, কলাপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকজ্বলা এমন মোহিনী অন্ধকার, আঁকাবাকা মেঠো পথের বাঁকে বাঁশ-কাঠে গড়া কিষাণের এসকল সরল আটচলা, এসকল আদী বাছুর এবং পরিণতবয়স্ক গবাদি পশু, সর্বোপরি গোটা জনজীবনে প্রসারিত উৎপাদন শৃঙ্খলে আবদ্ধ সভ্যতার অভিযাত্রী অজেয় মানুষ; তারা যেন দৈনন্দিন জীবনধারণের স্রোতে কেলিকলারসে যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে অনন্তের পথে ভেসে যাচ্ছে, ক্যানভাসে তাদের প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, স্বচ্ছন্দ ঋজু গতিভঙ্গিমা এমনভাবে বাঁধা পড়েছে, মনে হবে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্য ছাপিয়ে মেঘেতে ঠেকেছে তাদের মস্তক এবং পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে মূল, তাদের শ্রম-ঘামের ঝংকার, চেষ্টার সঙ্গীত সমস্ত প্রাকৃতিক কোলাহল ভেদ করে আকাশ গঙ্গার কিনারে কিনারে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিতে একসঙ্গে ফেটে পড়ছে।

শহরের চৌমোহনার ইট-সিমেন্টের পুরো কঠিন আবরণ ফাটিয়ে একটা আস্ত ঝর্না যদি বন্য আদিম ভঙ্গিমায় জেগে উঠে রঙিন জলধারা হঠাৎ করে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করতে থাকত, পৃথিবীর অন্তরের এই নৃত্যপরায়ণ রসধারার প্রতি মানুষ যেমনি বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে দৃষ্টিপাত করত; তেমনি চোখে মানুষ সুলতানের আঁকা এসকল ছবি দেখেছে। এই ছবিগুলো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বাংলার অস্পষ্ট, ঝাঁপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন, অবগুণ্ঠিত অতীত খুঁড়ে প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে উপরের সমস্ত নির্মোক বিদীর্ণ করে শিল্পীর পারঙ্গম তুলির মাধ্যমে আমাদের যুগ এবং আমাদের কালের ঘাটে এসে আছড়ে পড়েছে। তারপর কোনোরকম ভনিতা না করেই বাংলাদেশের চিত্র-দর্শকদের উদ্দেশ্যে অমোঘ নির্দেশবাণী উচ্চারণ করেছে: আমাদের দেখো । বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে এবং মজেছে। রঙের পরশ দৃষ্টিপট ভেদ করে মনের পটে অক্ষয় হয়ে স্থির ইন্দ্রধনুর মতো ফুটে গেছে। গ্রাম বাংলার এই চলমান ইতিহাস প্রবাহের সঙ্গে দর্শকের তন্ময় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তারা নিজেদের অস্তিত্বকেও এসকল কান্তিমান, আয়ুষ্মান চিত্রের অংশ হিসেবে মনে করতে বাধ্য হয়েছে।

সকলে চিত্রকলার মর্ম বোঝে না, সূক্ষ্ম বোধ এবং উপলব্ধি অনেকের না থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষত সেই ইতিহাস গাজন-উৎসবের নটরাজের মতো অট্টরোলে যখন নেচে ওঠে। সুলতান বছর তিনেক আগে শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত তার সর্বশেষ প্রদর্শনীটিতে বাংলার আবহমানকালের ইতিহাসকে নাচিয়ে দিয়েছেন। যারাই এ চিত্রগুলো দেখেছেন, তাদের উপলব্ধিতে একটি কথা ভ্রমরের মতো গুঞ্জরণ করেছে। আমাদের সভ্যতার প্রাণ কৃষি আর কিষাণ হলো

সভ্যতার নাটমঞ্চের একক কুশীলব। যখন মানুষের কানে মহাকাশ আর মহাপৃথিবীর শ্যামের বেণু অপূর্ব সুরলহরী বিস্তার করে তাকে ক্রমাগত মর্তলোকের সীমানা থেকে ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্বতর লোকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তখনো এই প্রাচীন ভূখণ্ডটিতে আদলে এবং অবয়বে মানুষ সেই সনাতন মানুষই রয়ে গেছে। তাই সুলতানের আঁকা এই মানুষেরা বাংলাদেশের হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। যেখানেই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে সেখানেই আদিপিতা হলধর আদমের চেহারায় তারা উপস্থিত ছিল। তারা মিশরে ছিল, চীনে ছিল, ভারতে, ব্যবিলনে, গ্রিসে, রোমে সবখানে বন কেটে বসত গড়ার দিনে, মাটির মর্মমধু টেনে তোলার বেলায়, বনের অগ্নিকুণ্ড পরিত্যাগ করে ঘরের দাওয়ায় সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বালবার নম্র-মধুর ক্ষণে তারা হাজির ছিল। যেখানেই মাটি শ্রমশীল কর্মিষ্ঠ মানুষের শ্রমে যত্নে প্রসন্ন হয়ে ফুল-ফসলের বর দিয়েছে, উপহার দিয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণ, সেখানেই ইতিহাস গতিচঞ্চল পথ পরিক্রমার সূচনা করেছে। মাটি এবং মানুষের এই দ্বৈত সম্পর্ক, বিশদ করে বলতে গেলে, নিসর্গ এবং মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুলতানের আঁকা চিত্রমালায় এমন আকার পেয়েছে, এমন বরণ ধরেছে যে একান্ত নির্জীব এবং পাষণ্ড না হলে তার আবেদন অস্বীকার করা প্রায় একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলার বদলে সুলতান যদি আরব দেশে জন্ম নিতেন, মরুচারী বেদুইনদের ছবি আঁকতেন। যদি জন্মাতেন নরওয়ে, সুইডেনে তাহলে সমুদ্রচারী জেলেদের সভ্যতার পথিকৃৎ হিসেবে আঁকতেন। নেহায়েত বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছেন বলেই এই কৃষকদের সভ্যতার জনয়িতা ধরে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। সুন্দর প্রকৃতিতে নয় মানুষের মনই

সৌন্দর্যের নিবাসভূমি। চারদিকে দৃষ্টিরেখা যতদূর ধাবিত হয় এবং সামনে পেছনে চিন্তা-কল্পনা অনেক দূর বিহার করার পর যে অনড় বিন্দুটিতে এসে স্থির হয়, সংহত হয়, সেইখানে, কেবল সেইখানেই সৌন্দর্যের নিভৃত নিকুঞ্জ। সেজন্য একজন আরবের চোখে লু হাওয়া তাড়িত ধু-ধু মরুভূমি সুন্দর, একজন এস্কিমোর চোখে তুষার-আচ্ছাদিত ধবল তুন্দ্রা সুন্দর।

সুলতানকে বাংলার প্রকৃতিতে, বাংলার ইতিহাসে এবং বাংলার মানুষের শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ, পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনা এবং নিরীক্ষার অনেকগুলো পর্যায়। তার ব্যক্তি জীবন এবং শিল্পীজীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তাও কম বিস্ময়কর নয়। পরে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাবে। আপন অন্তরস্থিত সৌন্দর্যবোধ, নিসর্গ, ইতিহাস এবং জীবন্ত শ্রমশীল মানুষের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে ক্যানভাসে সবকিছু মূর্ত করে তোলা-এর সবটুকু তার একক শৈল্পিক-প্রয়াসের ফল নয়। তার জন্য এই সুপ্রাচীন দেশটিকে সাম্প্রতিককালে একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে হয়েছে। একটি উদ্ভিদ-সমতুল ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের মানব সাধারণের ভেতর বন্দুকের আওয়াজে, কামানের হুংকারে যে জাগরণ এসেছে, যা তাদের সম্মিলিত সৃষ্টিশক্তির তেজ উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছে, তার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। ইনকুয়েবেটর যন্ত্রের তাপে ডিমের খোলস ফেটে যেমন করে মুরগির বাচ্চা প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের উত্তাপে শিল্পীর অন্তর চিরে এসকল ছবি বেরিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সবটুকু আবেগ, সবটুকু

জীবনোল্লাস, সবটুকু স্পর্ধা এবং দুঃসাহস এই ছবিগুলো ধরে রেখেছে। এরকম একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা না ঘটলে সুলতানের তুলি কস্মিনকালেও এরকম আশ্চর্য ছবি প্রসব করতে সক্ষম হতো না, যত প্রতিভাই তার থাকুক, কিষাণ-জীবনের প্রতি তার অনুরাগ-মমতা যতই নিবিড় গভীর হোকনা কেন। বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের একেবারে অন্তঃস্থল থেকেই এসকল চিত্রের উদ্ভব। এ কারণে এ ছবিগুলো দর্শকের মনেও প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। হয়তো দর্শক সচেতনভাবে অনুভব করতে পারেন না, কিন্তু অন্তরালে এই বোধ ক্রিয়াশীল থাকে ঠিকই। ইতিহাসের এই জাগ্রত দেবতার প্রতি অজানিত শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে দলে দলে মানুষ এ সকল ছবি দর্শন করতে এসেছে। যুদ্ধে পরাজিত, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ ভেনিসের মরমে মরে যাওয়া জনসাধারণও আজ থেকে বহুকাল পূর্বে একদা তরুণ শিল্পী মিকেলেঞ্জোলোর অপূর্ব মূর্তি ডেভিডের দিকে ভেনিসের অপরাজেয় ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক হিসেবে মমতা-মেদুর নয়নে দৃষ্টিপাত করেছিল। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পী এবং সমালোচক এ দুজাতের দৃষ্টিসীমার অনেক দূরে এই পরিপ্রেক্ষিতের অবস্থিতির দরুন তারা এ অমর চিত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে প্রণতি জানাতে পারেননি।

.

২.

শিল্পকলার সঙ্গে সামাজিক গতিশীলতার একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ক্রিয়াশীল। স্থবির সমাজের শিল্পকলাও বলতে গেলে একরকম পরিবর্তনবিমুখ। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সেখানে একইরকম পট আঁকা হয়, একই ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করা হয়। নতুন পুরুষের অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা, অভিযাত্রার প্রাণস্পন্দন স্থবির সমাজের ঐতিহ্য নির্ভর শিল্পকর্মে কদাচিৎ সঞ্চারিত হতে পারে। পুরুষ-পরম্পরা একইরকম প্রক্রিয়ার একই বস্তু প্রথাসিদ্ধ উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, একে নির্মাণ বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। একটি অচল সমাজ ভেতর থেকে প্রাণ পেয়ে চলতে আরম্ভ করলে তার নানামুখী শিল্প-প্রয়াসের মধ্যে এই চলার বেগ, এই গতির ছন্দ নব নব ভঙ্গি এবং নব নব দ্যোতনার জন্ম দিয়েই চলে । শিল্পকলার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ঘটতে থাকে রূপান্তর।

সামগ্রিকভাবে বাংলার শিল্প-সাহিত্য ইংরেজি তথা ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটা নতুন বেগ, নতুন ভঙ্গি এবং নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অর্থাৎ এই সময়ের পূর্ববর্তী বাংলার যে চিন্ময় সৃষ্টি তা পরবর্তী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। পরবর্তীকালের চিন্ময় সৃষ্টিসমূহে এমন কতিপয় নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে; পূর্ববর্তী সময়ের যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম তন্নতন্ন করে দেখলেও যার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পরিবর্তন শুধু একা মৃন্ময় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আসেনি, গোটা সমাজের ধনবণ্টন থেকে শুরু করে আচার-বিচার, চিন্তা ভাবনা, রুচি-পছন্দ, পোশাক-আশাক সবকিছুর মধ্যে এমনভাবে এসেছে যে সন্ধান করলে ধরা পড়ে যাবে সম্পূর্ণ মানব সম্পর্কের ধরনটিই অল্পবিস্তর পাল্টে গেছে এবং সমাজের কাঠামো বা ছকটির মধ্যেও অনেকদূর পালাবদল ঘটে গেছে। এই সামাজিক পালাবদলের যে সুবিশাল যজ্ঞ,

সাহিত্যে তার গতিপরিক্রমা মাইকেল, বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে মুখ্যত ঝাঁক বেঁধে ফুটে উঠেছে। এসময়ের প্রাথমিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসসমূহের মধ্যে একটা দ্বিমুখী মনোভঙ্গি সবসময়ে লক্ষ্যগোচর। একদিকে ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতির স্পর্শে স্রষ্টাকুল শিউরে শিউরে জেগে উঠেছেন আর অন্যদিকে এই জাগরণের বেগ-আবেগ ঐতিহ্যের ভেতর চারিয়ে দেয়ার জন্য ঐতিহ্যের ভিতটি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন এবং সম্প্রসারিত করে যাচ্ছেন। সাহিত্য নব্য-ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মনীষার স্পর্শ এবং বিত্তের সমর্থনে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন কলেবর ধারণ করে। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত চিত্রকলার ভাগ্যে সে সুদিনের আগমন ঘটেনি। সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে চিত্রকলার প্রতি অনুরাগের অভাবই সেজন্য দায়ী। আর এক অংশ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, ধর্ম-অর্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে চিত্র-চর্চার যে চল ছিল তাতে ইউরোপ এবং ইউরোপীয়ানার কোনো প্রভাব সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে পড়তে পারেনি। তাছাড়া চিত্রকলার প্রসার এবং ব্যাপ্তির সঙ্গে সামগ্রিক সমাজের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নটিও বিজড়িত ছিল। তাই অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালি চিত্রকরেরা স্বেচ্ছায় ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির অক্ষম অনুকরণ এবং নবিশগিরি করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা যা আঁকতেন বাঙালি চিত্রকরেরা হুবহু তার কার্বন কপি তৈরি করতেন। এ অবস্থাটা বেশ কিছুদিন চলেছে। এই ইউরোপ-নবিশ চিত্রকরদের কারো অঙ্কন পদ্ধতিতে সৃষ্টিশীলতার ছন্দ সঞ্চারিত হয়নি। এ পর্যায়ের চিত্রশিল্পীদের কেউ দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নেয়ার কথা দূরে থাকুক, যে ইউরোপের অনুকরণ করেছেন দিবস-রজনীর প্রাণান্তকর পরিশ্রমে, তাদের সামান্য অনুমোদন পর্যন্ত লাভ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই

সর্বপ্রথম ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির অনুশাসন ছিন্ন করে একটা নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কারের হার্দ্য এবং মেধাবী প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রাজস্থানী, মোগল,অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি চিত্রকলার প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেন এবং এসবের মধ্যে তার অভীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়ে যান। তাছাড়া সেসময়ে প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। প্রাচ্য শিল্পাদর্শের মহিমা। প্রচার এবং প্রাচ্যরীতির শিল্পের প্রসারকল্পে এই শিল্পী স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ওকাকুরা এবং অবনীন্দ্রনাথ দুজনে কে কাকে প্রভাবিত করেছিলেন বলা মুশকিল। মোটের উপর দুয়ের সাক্ষাতের ফলে একটা চরম অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই সময়টার কথাও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। সবেমাত্র চিত্রকলা ব্লকের মাধ্যমে মুদ্রিত করে পত্র-পত্রিকায় ছেপে সাধারণের গোচরে আনার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এদেশে। গোটা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লেগেছে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারার একটা দুর্বার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ চাহিদা: জাতীয় সাহিত্য চাই, জাতীয় বিজ্ঞান চাই, জাতীয় শিল্প, জাতীয় বাণিজ্য চাই। ভারতের উঠতি বুর্জোয়া সর্বক্ষেত্রে নিজের অধিকার প্রসারিত করার জন্য মারি কি মরি পণ করে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার একটা নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করলেন। তা সর্বাংশেও যেমন ভারতীয় নয়, তেমনি সর্ব অবয়বে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণও নয়। দুয়ের সংশ্লেষে হয়ে উঠল তৃতীয় বস্তু। অসাধারণ মৌলিকত্বসম্পন্ন ও সকল চিত্রকর্ম দেশের আলোকিত অংশের মন কেড়ে নিল ।

বিদেশীরাও প্রশংসা করল। অবনীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় শিল্পের জনক এবং ভারতের আত্মার অমর উদ্বোধক পুরোহিত হিসেবে আখ্যাত হলেন। কিন্তু কোন ভারত? যে ভারতে যক্ষ দয়িতার বিরহে একাকী অমোচন করে, যে ভারতে মোগল সম্রাট শাজাহানের ধ্যাননেত্রে তাজমহলের মর্মর সমাধিতলে শয়ান মমতাজ বেগমের মতো সুন্দর মৃত্যুস্বপন ঘনিয়ে আসে। অতীত ইতিহাস থেকে সন্ধান করে যে রীতি ধ্যানে, সাধনায় বের করে আনলেন; গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা অতীত রোমন্থনের মধ্যেই সীমায়িত রাখলেন। অতীত তার সামনে এমন কুহক জাল মেলে ধরেছিল যে তার গণ্ডি ভেদ করে বর্তমানের পথে পদচারণা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। চলমান জীবনের কোনো ছবি আঁকলেও অতীতের সেই সুন্দর কুয়াশা এসে বর্তমানের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মগুলো ভারতের চিত্রকলার আকাশে উজ্জ্বল অনুপম বরণবিশিষ্ট ইন্দ্রধনুর মহিমা নিয়ে জেগে থাকবে, একথা সত্যি। কিন্তু সেগুলো বাস্তবের কেউ নয়। হালকা মনোরম পুঞ্জ-পুঞ্জ রঙের প্রলেপে সৃষ্ট অর্ধেক শরীর অর্ধেক ছায়া মাত্র। শুধু অকাশে সঞ্চরণ করে, মেরুদণ্ড সোজা করে স্মৃতি স্বপ্নভারে ভারাতুর এসকল ফিগার মাটিতে দাঁড়াতে পারবে না।

তার এই সীমানা শিল্পী স্বয়ং জানতেন। জানতেন এই যে ফাঁক রয়ে গেল তা তিনি ভরাট করতে পারবেন না। এ তার সাধ্যের বাইরে। তিনিও তার আঁকা চিত্রের মতো স্বপ্ন-স্মৃতিভারে অতিশয় কাতর। অবনীন্দ্রনাথ তার বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটিতে শিল্পের তত্ত্ব হিসেবে যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাও তার স্মৃতি স্বপ্নেরই অংশ মাত্র। তথাপি তিনি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে কামনা করতেন, কেউ একজন আসুক যে আঁকবে নিটোল

রক্তমাংসবিশিষ্ট সামাজিক মানুষের ছবি। বোধকরি সে আশায় বুক বেঁধে বেঙ্গল আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং বাঙ্গলার ব্রত' বইটি লিখেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বাঙ্গলার ব্রত' বইটি বাঙালি সমাজ জীবনের আনাচ কানাচ অনুসন্ধান করে বাঙালির শিল্পের প্রাণভোমরাটিকে সূত্রাকারে উপস্থিত করেছিলেন। একটি গভীর স্বাদেশিক এবং শৈল্পিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। এই সমাজের সহজ সরল কিন্তু লীলায়িত শিল্প-নিদর্শন এবং অন্তরালবর্তী মটিফ'সমূহ আত্যন্তিক যত্নে নৃবিজ্ঞানীর দক্ষতা সহকারে শুধু সংকলন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তার ছাত্ররা যেন নিজেদের এ সকল ঐতিহ্য-সম্পদকে নিয়মিত চর্চা এবং ক্রমাগত নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন, সেদিকে তিনি সতত সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সে প্রত্যাশার সবটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায়ের শিল্প-সাধনার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সে আকাক্ষার অনেকখানিই চরিতার্থতা লাভ করেছে।

.

৩.

নন্দলাল বসুই প্রথম ব্যক্তি যাকে প্রকৃত অর্থে সার্থক বাঙালি চিত্র-শিল্পীর শিরোপা দেয়া যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের কুয়াশাচ্ছন্ন স্বপ্নমণ্ডিত তন্ময় পরিবেশের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে

নন্দলালের রেখাপ্রধান চিত্রসমূহ বস্তু-ঘনিষ্ঠতা লাভ করে বাস্তব জগতে মেরুদণ্ডের উপর থিতু হয়ে দাঁড়াবার জন্য যেন সংগ্রাম করছে। তাই বলে নন্দলাল বসু পৌরাণিক চিত্র আঁকেননি এমন নয়। তবে তার পৌরাণিক চিত্রগুলো দেখেও মনে একটা ধারণা জন্মাবে যে, সেগুলো পৌরাণিক জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। তার ধ্যানী বুদ্ধ ছবিটির কথা ধরা যাক। এখানে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্নতাটাই সব নয়, তার রক্ত-মাংসের অস্তিত্বটাও ধরা পড়েছে। আবার যখন তিনি রবীন্দ্রনাথ কিংবা মহাত্মা গান্ধীর ছবি আঁকেন রেখার বাঁকে বাঁকে একটুখানি পৌরাণিকতা যেন প্রাণ পেয়ে ওঠে। চলমান সাঁওতাল রমণীর চিত্রে যে ভঙ্গি ফুটে বেরিয়েছে তা অনেকটা এরকম, চিত্রটি সাঁওতাল রমণীর, কোনো সন্দেহ নেই। শরীরে যৌবন জ্বলছে, খোঁপায় দুলছে বনফুলের আভরণ, বলিষ্ঠ পায়ের গোছ, চলার ছন্দে বিজন বনভূমি ছন্দায়িত হয়ে উঠছে। এসব তো রয়েছেই। এটুকু না থাকলে শিল্প হবে কেমন করে? তবু, তবু কোথায় এ রমণীটির আদলের মধ্যে এমন কিছু আছে যেন একটুখানি ফুরসত পেলেই সে সাঁওতাল বেশভূষা পরিত্যাগ করে নারীত্বের একটা ইমেজ মাত্র হয়ে স্বপ্নলোক ধ্যানলোকের দিকে ধাওয়া করবে। নন্দলালের আঁকা বিরান মাঠের মাঝখানের তালগাছ দেখেও একইরকম ভাবনা জন্মাবে। এই তালগাছটি তালগাছ বটে, আবার তালগাছ নয়ও। সামান্য সুযোগ পেলেই অণু অণু স্বপ্ন হয়ে আকাশলোকের কোথাও মিলিয়ে যাবে । শিল্প-সাহিত্যে কেউ বাইরে থেকে ঘরে ফেরার সাধনা করে, কেউ ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার, যার যতদূর যাত্রা হয়, ততদূর সফলতা। নন্দলাল বসু এই বাইরে থেকে ঘরে আসার সাধনাই করেছিলেন। সবটা ফিরতে পারেননি। তথাপি নন্দলাল একজন বিরাট শিল্পী। বাংলার চিত্রশিল্পীকে

লোকায়ত ও ধ্রুপদ, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য রীতির মিশেল ঘটিয়ে, নানা ভাঙচুরের মাধ্যমে একটি ফ্রেমের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

.

৪.

যামিনী রায় ঘরেই ছিলেন, তাকে ছবি আঁকা শিখতে হয়েছে বটে কিন্তু ঘরে ফেরার সাধনা করতে হয়নি। বাংলার চিত্রকলার ঐতিহ্য আপনিই সেধে এসে তার তুলিতে ধরা দিয়েছে। কোনো গুরু এবং প্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদ অর্জন করার বহু আগে কলালক্ষ্মী আদর করে এই দরিদ্র এবং অভিভূত ভক্তের হাতে গোপন অমৃত ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছিলেন।

যামিনী রায় সম্পর্কে পেছনের কথা বলা প্রয়োজন। তৎকালীন গ্রামীণ বা শহুরে মধ্যবিত্তদের কেউ ছিলেন না এই যামিনী রায়। চিত্রকলা কিংবা অন্যান্য বিষয়ে যে নবীন ভাবধারার জোয়ার শহর কলকাতায় খলখল ছলছল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল আর্ট স্কুলে আসার পূর্ব পর্যন্ত তা তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। ভক্তিমান এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাহিত্যরসিকের পুত্র, সুতরাং ভক্তিই তার ধ্যান এবং ভক্তিই জ্ঞান হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। দেশের যে সকল কুমোর পুরুষ-পরম্পরা ঠাকুর দেবতার মূর্তি গড়ত, পুতুল বানাতো, পট আঁকত এবং জীবিকার তাগিদে এসব যারা বাংলাদেশের হাটে হাটে মেলায়

মেলায় ফেরি করে বেড়াতো তাদের কাছেই প্রথম যামিনী রায়ের হাতে খড়ি। যদি কলকাতা শহরে একটা আর্ট স্কুল জন্ম না নিত, একটা শিল্প আন্দোলন মধ্যবিত্ত সচেতন বাঙালি মানসে সুবর্ণ তরঙ্গ না তুলত কে জানে হয়তো উত্তরকালে উক্ত যামিনী রায়ও একজন দক্ষ পট আঁকিয়ে এবং পুতুল গড়িয়ে হিসেবে ধর্মপ্রাণ হিন্দু মহিলার মনে ভক্তি এবং শিশুদের মধ্যে আচমকা বিস্ময় বোধ জাগিয়ে নামহারা পটুয়াদের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যেতেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ঢলঢল লাবণীস্রোতে তো সঞ্চিতই ছিল তার মানসপট। আর্টস্কুলের শিক্ষা তাতে একটা স্নিগ্ধ তরঙ্গ জাগিয়ে দিল। বাংলার কুমোরের হাতে গড়া পুতুলেরা, কালীঘাটের ভাসাভাসা পটলচেরা চোখের অচল পটেরা যামিনী রায়ের হাতের জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় নতুন প্রাণ পেয়ে বহু যুগ আগের ঘুম ভেঙে হঠাৎ করে জেগে উঠল যেন । যামিনী রায়ের আঁকা এ সকল ছবি দর্শক দেখামাত্রই চিনে নিল। পুলকিত বিস্ময়বোধের তাড়নায় কলারসিকের মনে একটা আশ্চর্যান্বিত জিজ্ঞাসা গুনগুনিয়ে উঠল: আরে এ তো আমাদের জিনিস, এই যে নারী তার অনুপম দেহ বল্লরী, পূর্ণিমা চাঁদের আকৃতির মুখমণ্ডল সে তো প্রতিদিন আমাদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালে, এমন রসঘন নিবিড় গভীর চোখের দৃষ্টি, তার আলোকেই তো আমাদের সমাজ-সংসার আলোকিত। এমন নিটোল সুকুমার শোভনশালীন গড়ন ভঙ্গি, আর এত স্নিগ্ধ, এত নম্র যেন দলে দলে ব্রজবালারা কেলিকলা লীলারসের বেশভূষা ছেড়ে আমাদের সংসার-সীমান্তে কন্যা জায়া ভগিনী হয়ে আটপৌরে বসনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যে-ই আঁকুক এ সকল ছবি; যে ঘনীভূত আবেগে বৈষ্ণব কবিরা গঠন করেছেন অতীতে পদাবলীর শরীর;

সেই অচঞ্চল আবেগ, সেই অচলা ভক্তি নতুন ব্যঞ্জনায় মর্মরিত হয়ে উঠেছে এসকল ছবিতে। কে আঁকল, কে সেই আমাদের অতিশয় আপনার জন চিত্রকর।

রাতারাতি বাংলাদেশে বাংলাদেশের নিজস্ব চিত্রকর হিসেবে, বাংলার গহন সৌন্দর্যের রূপকার হিসেবে যামিনী রায় পরিচিতি লাভ করলেন। খ্যাতির ঢেউ দেশ পেরিয়ে বিদেশেও একটুখানি হাওয়া সৃজন করল। ধীমান কলাবিদ শাহেদ সোহরাওয়ার্দী যামিনী রায়কে নিয়ে বিলেতের 'টাইমস' পত্রিকায় একটি মনস্বিতা সম্পন্ন রচনা প্রকাশ করেছিলেন। প্রধানত শাহেদ সোহ্রাওয়ার্দীর দূতিয়ালীতেই যামিনী রায়ের বৈদেশিক খ্যাতি। আমাদের এ রচনার নায়ক শেখ সুলতানের শিল্পী জীবনের সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করার বেলায় আরো একবার আমাদেরকে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

যামিনী রায় দেশীয় রীতিতে ঐতিহ্যনির্ভর মনোমুগ্ধকর অঙ্কনশৈলীর উদ্ভাবক এবং বাংলার একান্ত ঘরোয়া চিত্রশিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকে বোধকরি জানেন না, একসময়ে ক্লাসিক প্যাটার্নে অনেক ছবি তিনি এঁকেছিলেন। ইউরোপীয় চিত্রকরের আদর্শে অঙ্কিত এসকল চিত্র আজকাল কোথায় কি হালে আছে সম্ভবত কেউ বলতে পারবেন না। ছবি হিসেবে এগুলো একেবারে উৎকর্ষ বিবর্জিত ছিল একথাও বলা চলে না। তথাপি সে পথে শিল্পীর যাওয়া হয়নি। এটা শিল্পী যামিনী রায়ের জন্য ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে তা আজ অনুমান এবং বিতর্কের বিষয়। মোটকথা সে সময়ে দেশের মানুষ যামিনী রায়ের ছবির যে বিশেষ ভঙ্গিটি এবং যে বিশেষ অন্তরাবেগটির

সহজ দৃষ্টিতে প্রশংসা করত, দেশীয়ানার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারত অনায়াসে, অনবরত যামিনী রায়কে সেই ছবিই এঁকে যেতে হয়েছে।

তুলির স্বচ্ছন্দ টানে টানাটানা ভাসাভাসা চোখ, চোখের ভেতর থেকে প্রকাশমান দিঘির বুকের নিথর কালো গভীর জলের অতল প্রশান্তি, মুখে মাখানো এমন একটা সহজ সারল্য, এমন একটা সহজিয়া আবেগ যে দর্শনমাত্রই মনে একটা প্রীতির ভাব ঢেউ খেলে যায়; এই সহজ গভীর ভাবের শিল্পী যামিনী রায়। একজন শিল্পী অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রকাশভঙ্গির যে একটা সহজতা, অনায়াসপনা অর্জন করে, এটা সে সহজতা নয়। এই সহজতা জলের মতো সরল, ঐতিহ্যের ভেতর থেকে সংস্কৃতির মর্মমধুর ভাণ্ডার থেকে বালক বয়সেই মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি তা মাতৃস্তন্যের মতো পান করেছিলেন। তারপরেও কিন্তু গভীর সাধনার আশীর্বাদ ছাড়া কেউ তা অর্জন করতে পারে না। তবে এই সাধনার ধারাটা যত বেশি সচঞ্চল মনোবৃত্তির অনবচ্ছিন্ন অন্তরাল প্রক্রিয়া বাইরে তার অভিঘাত বড় বেশি পরিদৃশ্যমান নয়। কোনো কোনো ওস্তাদ ঘরানার ছোট ছোট ছেলেরা যেমন গলা খেলিয়ে দুরূহ রাগ-রাগিনীর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় সে রকম আর কি। সেখানেও একটা শিক্ষার প্রশ্ন থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থী তা অজান্তে বিনাশ্রমে বিনাযত্নে পরিবেশের কাছ থেকে অর্জন করে ফেলে। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যাই আঁকুন না কেন তার ছবিতে একটা বাৎসল্য রসের আভাস বড় বেশি ফুটে ওঠে। কতিপয় পরিচিত অভিব্যক্তির বাইরে, অন্য কোনো ভঙ্গিতে, অন্য কোনো রসমূর্তিতে যামিনী রায়কে বড় একটা দেখা যায় না। তার শিল্পী জীবনের কোনো বাঁক, কোনো মোড়, কোনো পরিবর্তন,

কোনো রূপান্তর নেই যেন। আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যাওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা তাকে কোনোদিন পেয়ে বসেনি। সুন্দর নিশ্চল বস্তুঘনতার জগৎ থেকে আকাশমণ্ডল কিংবা চলমান জগৎ প্রপঞ্চ অভিমুখে অভিযাত্রা নয়, অভিসারের আকাঙ্ক্ষাও তাকে তাড়িত করেনি। সুন্দর বদন, পেলব সুকুমার শরীর এবং প্রাণ লাবণ্যের রূপকার যামিনী রায়। যামিনী রায়ের হাতে বাংলার পুতুল, কালীঘাটের পট এবং আরো নানা শিল্প ঐতিহ্য নবীন জীবন লাভ করেছে।

.

৫.

তাই বলে যামিনী রায়ের শিল্প শ্রম-ঘামের সংঘাত এবং জীবনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতরণ করতে পারেনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল আরো একজন শিল্পীর । তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের কাকের ছবি জয়নুল আবেদীনের ললাটে শিল্প-সম্ভাবনার সোনালি রেখা এঁকে দিয়েছিল। এটা চিন্তাকে নাড়া দেওয়ার মতো একটা সংবাদ বটে। অবনীন্দ্রনাথের অলকাপুরীর দূরদূরান্তের আধেক স্পষ্ট আধেক অস্পষ্ট স্বপ্নবিজড়িত রোমাঞ্চ কল্পনা নয়, নন্দলালের ছন্দায়িত অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক অবাস্ত বের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়া ছিমছাম সুন্দর কোনো ফিগার নয়, আর মুখে বৈষ্ণব কবিতার ঢলঢলে লাবণি মাখানো গহন নয়না কোনো কামনার ধন নারীও নয়, অমঙ্গলের বার্তাবাহক একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাক- তাও আবার মন্বন্তরের কাক শিল্পীর তুলিতে জন্মলাভ করে সকলের

মনোহরণ করল। কিন্তু কেন? আর যিনি আঁকলেন তার সমাজের মধ্যে ঐতিহ্যের ভেতরে, পরিবার কিংবা পরিমণ্ডলের পরিসরে তুলির লেখনের কোনো আদর ছিল না। তথাপি এই তরুণ মুসলমান শিল্পী সৃজনশক্তির যাদুতে কাকের ছবির মধ্য দিয়ে মন্বন্তরের সমস্ত ভয়াবহতা, সমস্ত হাহাকার, সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সমস্ত হৃদয়হীনতা এমনভাবে মূর্ত করে তুললেন, এই সংবাদটির ভেতরে অনেকগুলো বড় বড় সংবাদ আত্মগোপন করে আছে।

অবনীন্দ্রনাথ যে সমাজের নিরাপদ পাটাতনে উপবেশন করে স্নিগ্ধ রুচি এবং পূর্ণিমার মধুযামিনীর স্বপ্নচর্চা করতেন, কালের ইঁদুর সেই নিশ্চিন্ত বিলাস বাসরের কড়ি বরগা এবং খিলানে খিলানে দ্রংষ্টারেখা প্রবিষ্ট করিয়ে কেটেকুটে একাকার ছত্রখান করে ছেড়েছে। আর সেই রামধনু ঘেঁকে তোলা চমৎকার সূক্ষ্ম রুচিরেখা কালের জল সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে নিয়ে গেছে। নন্দলালের স্বপ্ন-বাস্তব জড়াজড়ি করা ফিগারসমূহ ভয়ংকর এবং অমঙ্গলের ত্রাসিত রূপ দেখে সভয়ে পালিয়ে বিশ্বভারতীর কলাভবনে মুখ লুকিয়ে বেঁচেছে। যামিনী রায়ের চাঁদপানা মুখের রমণীরা দুর্ভিক্ষের দেশ ছেড়ে, হাভাতের হা-ঘরেদের মুলুকের সীমানা অতিক্রম করে নগদ রজতমুদ্রার বিনিময়ে গোরা সৈন্যদের বগলে চড়ে ইংল্যান্ড আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছে। এই দুর্ভিক্ষ এই অনাহার যন্ত্রণা, এই ধ্বংসলীলা এই অমঙ্গলের ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করবে কোন্ শিল্পীর চেতনালোক? জয়নুল আবেদীন তার শিল্পী-জীবনের সূচনাপর্বে সরল সবল বাহু দুটি দিয়ে এই বিনষ্টি, এই বীভৎসতাকেই আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

গোটা মুসলিম সমাজটার চিত্রকলার হাতেখড়ি হয়েছে জয়নুলের মাধ্যমে। ব্যক্তি হিসেবে জয়নুলের জন্য এটা একটা অভাবিত ঘটনা বটে। কিন্তু সমাজটার কথা চিন্তা করলে মনে প্রত্যয় জন্মায় যে ঠিক সময়েই ঠিক মানুষটি জন্ম নিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের সিংহনাদ এবং বুলবুল বচন বাংলার কাব্যলোক ও সঙ্গীতলোকে বজ্রবাণ আর পুষ্পবৃষ্টি দুই-ই বর্ষণ করেছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম নামের সিংহ-দরজা পেরিয়ে প্রাণের পতাকা উড়িয়ে বাংলার কাব্য কাননে এলেন জসীম উদ্দীন, মহুয়ার মাদকতার সঙ্গে নিধুয়া পাথারের বিরহব্যথা সুরের দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে দিয়ে সঙ্গীত জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন আব্বাসউদ্দীন। প্রায় একই সময়ে চরণে ঝংকার তুলে অপরূপ লীলালাস্য এবং গতিভঙ্গিমাসহ বুলবুল চৌধুরী গন্ধর্ব জগতে এসে উদিত হলেন। এই শিল্পী চতুষ্টয় আব্বাস-জসীম-জয়নুল-বুলবুল, ক্ষেত্র আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, কোথায় যেন এরা একই সূত্রে বাঁধা পড়ে আছেন। ছোটখাট বৈপরীত্যসমূহ আলাদা করে নিলে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে চারজনের মর্মমূলে একই ধরনের জীবনানুভূতি ক্রিয়াশীল। চারজনের ধমনীর শোণিত প্রবাহে একই আকারের লোহিত তরঙ্গ জাগছে আর ভাঙছে। একই সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে একই সমাজের ভেতর থেকে একই সৌন্দর্যের অগ্নিকাণ্ডে আত্মাহুতি দান করার জন্য এই ভক্ত চতুষ্টয় যেন সমবেত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের মানসে কর্ষণে ঘর্ষণে এবং অনুশীলনে যে জীবনবোধের উন্মেষ এবং বিকাশ, এদের অবস্থান তার চাইতে অনেক দূরে। বুদ্ধির চাইতে আবেগ, চিন্তার চাইতে সংবেদনা, রীতির চাইতে স্বতঃস্ফূর্ততার দোলা, অনুশীলনের চাইতে সহজ প্রকাশের প্রবণতা এদের অনেক অনেক গুণে বেশি। এদের সকলের সাধনা এসকল গুণে গুণান্বিত এবং পাশাপাশি এ সকল অবগুণে অবগুণ্ঠিত বটে। তথাপি এ চারজন

সমাজসংস্কৃতির এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত অবলীলায় প্রকাশমান করে তুলেছেন যার বোধটি পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর ছিল না, অথচ তা এদেশেরই, এ সমাজেরই কর্মজীবী মানব-গোষ্ঠীর উজ্জ্বল এক উত্তরাধিকার ।

উদাহরণস্বরূপ জসীম উদ্‌দীন যখন লিখলেন: "এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল কালো মুখে কালো ভ্রমর কিসের রঙীন ফুল"-এই বর্ণনার একটা অমোঘ আকর্ষণী শক্তি আছে। শব্দের মধ্যে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না, শব্দার্থের মধ্যেও নয়, কিন্তু একঝোঁকে সবটা উচ্চারণ করে গেলে একটা সুঠাম কান্তি গ্রাম্য যুবকের ছবি মনের পর্দায় ফুটে ওঠে। সেই ছবিটাই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। সে আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা একরকম অসম্ভব। অবচেতনে গোপন, বাঙালির দ্রাবিড় পুরুষের চেহারায় চাষার ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়ালে পর সজ্ঞানে হেলাফেলা করলেও অবচেতনে খোঁজখবর নিয়ে সেবাযত্ন না করে উপায় নেই। আবার যখন জসীম উদ্দীন বলেন, "ইতল বিতল ফুলের বনে ফুল ঝুরঝুর করে: দেইখ্যা আইলাম কালো মেয়ে গদাই নমুর ঘরে। ধানের পরে ধানের ছড়া তার উপরে টিয়া: নমুর মেয়ে গা মাজে রোজ তারি পাখা দিয়া"-এই চারটি পঙক্তি পাঠ করার পরে একটি কর্মিষ্ঠা কালো বরণ নমু সমাজের চঞ্চলা বালিকার ছবি যেন হাওয়া ফাঁক করে মূর্তি ধরে জেগে ওঠে। তাকে কি সুন্দরী বলা যাবে? এদেশের কাব্যে সৌন্দর্যের বাঁধা ধরা যে সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, না সে বিচারে নমুর মেয়েকে সুন্দরী বলা যাবে না। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, রাধা-কৃষ্ণলীলায় এমনকি মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে সে অর্থেও নমুকন্যা সুন্দরী নয়। ইরান তুরানের রূপকথা উপকথা অবলম্বন করে পুঁথি-সাহিত্যের যে ভাণ্ডার রচিত হয়েছে,

সেখানে কাজলকাটা সুর্মা আঁকা চোখের যে সকল নায়িকাকে আদর্শ সুন্দরী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাদের দলেরও কেউ নয় আমাদের এই নমু ঘরের কালো বরণ বালিকাটি। তাহলে কি তাকে 'সুন্দরী নয়' বলব? এইখানে সমস্ত অনুভূতি পড়ে পাওয়া নান্দনিকবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে, চেতনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দৈব বাণীর মতো ধ্বনিত হতে থাকে: সে সুন্দরী সে সুন্দরী। কোনো ধরনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মেলে না কিন্তু সুন্দর হয় কেমন করে। আর অসুন্দর বলতেও মন চাইছে না, আবার সে দৈববাণী ঘোষিত হয় চেতনার স্তরে: এ সৌন্দর্য বিচারের নয় বোধ করার, বাইরের নয় ভেতরের। এ তর্ক করার নয় মেনে নেয়ার। লম্বা মাথার চুল কালো বরণ চাষীর ছেলে সে সুন্দর, নমুর ঘরের কালো মেয়ে যে সর্বক্ষণ কাজ করে বেড়ায় সে সুন্দরী। এ সুন্দর এ সুন্দরীরা শুরু থেকে আমাদের ইতিহাস আলো করে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। আমাদের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত, কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তা যারা কস্মিনকালেও করেনি অথচ ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকলে হাজার হাজার বছর ধরে পিষ্ট হয়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুন্দর পেলব বৈশিষ্ট্যসমূহকে অনাদর করতে শিক্ষা করেছে, জসীম উদ্দীনের কবিতা তার প্রথম শিল্পিত প্রতিবাদ। জসীম উদ্‌দীন কাব্যকলার সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন শ্রমনিষ্ঠ মানুষ-মানুষীর মধ্যে। এই শ্রমনিষ্ঠ মানুষের অন্তরের সুন্দর সুরে সুরে মুক্তি দিয়েছেন আব্বাসউদ্দীন। এই মানুষদেরই চলার ছন্দ, জীবনস্পন্দনের হাজারোরকম বৈচিত্র্য বুলবুল চৌধুরী নাচের তালে তালে ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়নুল আবেদীনের ছবিতে এই কর্মচঞ্চল মানুষ-মানুষীরাই নতুন প্রাণের বরে চিরদিনের জন্য আয়ুস্মান হয়ে রয়েছে। জয়নুল আবেদীনের হাত দিয়ে বাংলার চিত্রকলা নতুন একটা কক্ষপথে যাত্রা শুরু করল। জয়নুল

আবেদীনের শিল্পকর্মে একটি সমাজের গভীর জীবনভাবনা আন্দোলিত হয়েছে, একটি সমাজের চলচ্ছবি দ্রুত ধাবমান বিজুরীরেখার গতিশীলতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অবনঠাকুর, নন্দলাল কিংবা যামিনী রায়কে জীবনের সে সংঘাতময় চলমানতা, সে গতিচ্ছন্দ তাদের শিল্পে মূর্ত করার কথা ভাবতে হয়নি। সে কারণ আংশিক সামাজিক এবং আংশিক শৈল্পিক। অবনীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে মানুষ, যে বোধ উপলব্ধি তার শিল্পচর্চার রক্তবাহী শিরার মতো তাকে বেগ আবেগ দুই-ই যুগিয়েছে, সেই বোধ সেই উপলব্ধি তাকে ইতিহাসের অতি দূর দূরান্তরের পরিব্রাজক করে ছেড়েছে, রামধনুর কায়াহীন ছায়ার সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়েছে। এদেশীয় চিত্রকলার নবজীবন প্রাপ্তির প্রদোষকালে অবনীন্দ্রনাথের এই ভূমিকা অতিশয় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ছিল। মাটির পৃথিবীতে অনুপম স্বর্গলোক সৃজনের প্রয়াস নন্দলালের পক্ষেই শোভা পায়। চাঁদপানা মুখের একই ডৌল একই ভঙ্গির প্রতিমা নির্মাণ যামিনী রায়কেই মানায় ভাল।

কিন্তু জয়নুল আবেদীন? তিনি ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন যুগের, ভিন্ন সমাজের শিল্পী। তার চেতনার স্তরে স্তরে ভিন্ন রকম জীবনবীক্ষা এবং জীবন অভিজ্ঞতা মর্মরধ্বনিতে বাংলার শ্রমশীল সমাজ, বৃহত্তর অর্থে বাংলার কৃষক সমাজের জীবন সঙ্গীত বাজিয়ে তুলছে। যোজন যোজন মাঠব্যাপী ছড়ানো উৎপাদন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাংলার কৃষক, বংশ-পরম্পরা কায়িক শ্রমে যাদের একমাত্র উত্তরাধিকার। এই বৃক্ষপ্রতিম অচল সমাজের মানুষেরা শিল্পীর মনের দুয়ারে দুয়ারে সবেমাত্র টোকা দিতে আরম্ভ করেছে। শ্রমে-স্বেদে সিক্ত মলিনমুখো মানুষেরা শিল্পীর কাছে আবেদন জানাতে লেগেছে: আমাদের মূর্তিমান করো, প্রকাশিত করো। অবনীন্দ্রনাথ কেমন করে সে আহ্বান শুনতে পাবেন? নন্দলাল কেমন

করে স্নিগ্ধ রঙে চুবিয়ে রোদে পোড়া বৃষ্টিতে ভেজা এই মানুষদের ছবি আঁকবেন? যামিনী রায় কোন সাহসে সুন্দরীদের সঙ্গ ছেড়ে এমন নিখাদ চাঁছাছোলা জীবনসংগ্রামের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হবেন? এই নিসর্গনির্ভর মানুষদের বার্তাবাহক একজন শিল্পী প্রয়োজন। তাই এলেন জয়নুল আবেদীন।

তেরশ পঞ্চাশের ভয়াবহ মহামারী-মন্বন্তর, মহাযুদ্ধের বীভৎসতা এবং শহর কলকাতার দুঃসহ সামাজিক বাস্তবতা একযোগে তার স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে কাকের ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিল। একটি পর্যায়ে, শুধু একটি পর্যায়ে তার তুলি মানবতার বীভৎস করুণ রূপসৃষ্টির দিকে ধাবিত হয়েছিল। এটা শিল্পীর স্থায়ী পরিচয় নয়, পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা । শিল্পী জয়নুল তার যৌবন দিনে একবার জ্বলে উঠে, এই পর্যায়ের চিত্রসমূহের মধ্যে যুগের পরিবর্তন, শিল্প রুচি এবং শিল্পাদর্শের পালাবদল এবং সমাজ আদর্শের রূপান্তর কত-কিছুর ঘোষণা রটিয়ে দিতে পেরেছিলেন । এসকল কারণেই তার এ পর্যায়ের ছবিসমূহ হানা দিয়ে চিত্রপ্রেমিকদের মনে স্থান দখল করে নিতে পেরেছে।

কিন্তু সামাজিক চিত্রাবলীর মধ্যেই শিল্পী জয়নুলের প্রকৃত এবং স্থায়ী পরিচয়। যেসকল চিত্রের মধ্যে বাংলার ইতিহাস হাজার বছরের ওপার থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, শত অবগুণ্ঠনের অন্তরাল ভেদ করে গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষের সরল জীবনযাত্রা উঁকি দিতে পেরেছে, সেখানে কেবল সেখানেই জয়নুলের সুন্দর চিত্র শরীরে কান্তিমান হয়েছে। তার পিতৃনিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের ধারের ময়মনসিংহের সে পাটক্ষেত, সে চাষা, সে মাঝি, সে

নৌকা, সে ধানক্ষেত, হাল-লাঙল-বলদ, পাঁড়াগেঁয়ে বিয়ের আসর, পাল্কি চড়ে নববধূর শ্বশুর বাড়ি যাত্রা, দুধাল গাই, গুণটানা নাও, তেজী ষাড়, গাবের কষে রাঙানো জেলেদের মাছ ধরা জাল, কৃচিত কখনো একজন-দুজন বিরল সাঁওতাল রমণী, বাংলার আবহমানকালের চিরপরিচিত এসকল দৃশ্যে জয়নুল আবেদীন তার সুন্দরকে আবিষ্কার করেছিলেন। এ সুন্দর অবনীন্দ্রনাথের মায়ামরীচিৎকার সুন্দর নয়, নন্দলাল বসুর স্নিগ্ধ শোভন ধ্যান দৃষ্টির সুন্দর নয়, যামিনী রায়ের অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে অন্তর উদ্ভাসিত হওয়া সুন্দর নয়। এ সুন্দর রক্তমাংস চলা-অচলা, স্থূল-চিকনে মেশানো সুন্দর। জসীম উদ্দীনের কবিতার মতো তাকে হাত দিয়ে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো একটি আভাস মাত্র রচনা করে ধূপের শরীর ধরে হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় না ।

জয়নুলের আঁকা ছবিগুলো একটার পাশে আরেকটা সাজালে গ্রামীণ মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের বিচিত্রমুখী রূপটিই প্রকটিত করে তুলবে। মনে হবে এক একটি ছবি আরেকটি বড় ছবির স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। আর সে বড় ছবিটি বাংলার উৎপাদনশীল মেহনতী মানুষের সমাজ কাঠামো। এই পরিপ্রেক্ষিতটা আবিষ্কার করাই হলো চিত্রকলার ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদীনের মৌলিক অবদান।

আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে অবনঠাকুর-নন্দলাল-যামিনী রায়ের ঘরানা যে স্টাইল বা অঙ্কনশৈলী তিনি রপ্ত করেছিলেন, তার আপন বিষয়ে প্রয়োগের বেলায় দেখা গেল সে রীতি ছোট মাছধরা জালে সামুদ্রিক তিমি আটকাবার দুরাকাঙ্ক্ষার মতোই অকেজো এবং হাস্যকর। এই গ্রাম বাংলার শ্রম-ঘাম-সংগ্রামে কাতর মানুষদের চকচকে পেশী সাপের

ফণার মতো রঙের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় ফুলে উঠল। কখনো বা রঙের যাদু সময় সমুদ্র মন্থন করে এমন একখানা মুখদর্পণ কোত্থেকে টেনে আনল, চোখে পড়লে হঠাৎ করে অনেক প্রকাশহীন কথা বুকে কারণহীন ব্যথায় আকুলি বিকুলি করে। এই তো জয়নুল আবেদীন! অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের যে ধারাটি রামধনুর রঙে রঙে মুক্তি দিয়েছিলেন, ইতিহাসের স্বপ্ন-কল্পনার জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই একই ধারাটিকে তিনি অপার মমতায় বাংলার প্রাকৃত জনগণের জীবনের সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে গেঁথে দিতে পেরেছেন। এ কি কম কথা! তবু এই জয়নুল আবেদীন বড় বেশি একঘেঁয়ে, বড় বেশি প্রাদেশিক । ইনস্টিঙ্ককে ছাড়িয়ে তার ছবি কোনো উচ্চতর আবেদন, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সত্যি সত্যি অপারগ। তার ছবির নর-নারীগুলো যেন সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল এক একটা টাইপ বিষয়বস্তু। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ছাপ বড় একটা চোখে পড়ে না। তার শিল্পী জীবনেও তেরশ পঞ্চাশের হঠাৎ জ্বলে ওঠার ক্ষণটি ছাড়া আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো প্রাণধর্মী তাগিদ কিংবা প্রেরণার বড় অভাব। শেষপর্যন্ত জয়নুল আবেদীন চিত্র আঁকা শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন আর শিল্পী ছিলেন না। উনিশশ সত্তর সালের সর্বগ্রাসী বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের পর 'মনপুরা' শীর্ষক চিত্রে আরেকবার যৌবন দিনের মতো জ্বলে উঠবার একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা করেছিলেন। ভয়াবহতার প্রতীকরূপে ঢেউগুলোকে হাঙ্গরের বিরাট বিরাট হা-য়ের মতো করে এঁকেও ছিলেন। কিন্তু সে ছবি অভ্যস্ত হস্তের নির্মাণ কৌশল অতিক্রম করে সঠিক সৃজনকর্ম হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। চিত্রকলার বোধ এবং উপলব্ধির দিক দিয়ে, নিষ্ঠা এবং সাধনার গভীরতার বিচারে জয়নুল আবেদীন, অবনীন্দ্রনাথ,নন্দলাল, যামিনী রায় এই তিনজন শিল্পীর পাশাপাশি স্থান পেতে পারে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে দেখতে হবে। তথাপি জয়নুল

আবেদীন বড়,তার হাতে আটকোটি মানুষের একটি জাতি চিত্রশিল্পের দীক্ষালাভ করেছে। বলতে গেলে তার একক প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে একটি চিত্রকলার পীঠস্থান রচিত হয়েছে। একসময় ভারত ভাগ না হলে হয়তো জয়নুল আবেদীনকে সে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হতো না। এবং তিনি আরো বড় শিল্পী হতে পারতেন। কিন্তু সবকথার সারকথা হলো, ভারত বিভক্ত হয়েছিল। ছবি আঁকা বাদ দিয়ে জয়নুলকে ছবি আঁকার মাস্টার হতে হয়েছিল।

.

৬.

'কবিকে যাবে না পাওয়া জীবন-চরিতে'-রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দিত বাক্য কবির বেলায় সত্য হতেও পারে। কিন্তু কবিকে পাওয়া যাবে কোথায়? সহজ উত্তর: কবিতায়। কিন্তু কবিতায় যেটুকু পাওয়া যায়। অর্থাৎ কবির প্রাণ- পাতালের আলো আঁধারের ঝিকিমিকি- সেই চিন্ময় প্রাপ্তিতে মন যখন বশ মানে না, বুদ্ধি সন্তুষ্ট হতে চায় না, বাকিটুকু খুঁজতে হবে কোথায়? তারও সহজ উত্তর: জীবনে। তাহলে কথাটা দাঁড়ালো এই, কবিকে পাওয়া যাবে প্রথমে কবিতায়, তারপরে জীবন-চরিতে অবশ্য যদি হয় তেমন জীবন-চরিত।

শিল্পীকে পাওয়া যাবে শিল্পে। সেটাও এক ধরনের পাওয়া বটে। সে পাওয়া দিয়ে শিল্প উপভোগ করা যায়, তারিফ করা যায়, বাহবা দেয়া যায়, কিন্তু শিল্পের বিচার করা যায়

না। রেনেসাঁস পরবর্তী যুগে অনেক কলা সমালোচক রেনেসাঁস যুগের চিত্রকর ও ভাস্করদের অঙ্কনরীতি এবং নির্মাণশৈলীর নানারকম ব্যাখ্যা-বিচার করেছেন। চিত্রকলা এবং ভাস্করদের ইতিহাসে কার কোথায় স্থান, কার প্রভাব কার উপরে কতটুকু, কার প্রাতিস্বিকতা কতদূর এসব নিয়ে বিস্তর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। ভাসারীর সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থটির পাশে এসব তত্ত্ব এবং তথ্য বিন্যাস, নন্দনতত্ত্বের উর্ণাতন্ত্র বিস্তার বড় বেশি কাগুঁজে এবং বড় বেশি মেকী মনে। হয়। তার একটি মুখ্য কারণ, ভাসারী শিল্পের আর শিল্পীর এমন একটি সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছেন, পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্র কন্যার সজীব ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কের তুলনামাত্র যার সাথে করা যায়। তিনি বহু খ্যাত, কম খ্যাত এবং একেবারে অখ্যাত শিল্পী আর ভাস্করদের জীবন বৃত্তান্ত এমনভাবে সংকলন করেছেন, তাদের পছন্দ-অপছন্দ ঘরোয়া স্বভাব এবং বেপরোয়া প্রবণতাসমূহ এমনভাবে ধরেছেন, শিল্পে সেগুলোর ছায়াপাত কিভাবে ঘটেছে এমনভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, কাঁচের আধারে শাখা-পত্রে পল্লবে-মুকুলে বর্ধিষ্ণু তরুর দীঘল শরীর যেমন দৃষ্টিগোচর; তেমনিভাবে শিল্পীদের মানস-পরিণতির ছবিটি লক্ষগোচর হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচনায় এই সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত গ্রন্থটি এত অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে যে আরভিং স্টোন যখন মিকেলেঞ্জেলো ও ভ্যানগগ-এর জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন, সমারসেট মম যখন পল গঁগার জীবন কাহিনী লেখেন অথবা রমা ব্লা উপন্যাসের পরিসরে সঙ্গীতশিল্পী বেটোফেনের মানস-জীবনের নিরন্তর ঝঞ্ঝাকে ধারণ করতে চেষ্টা করেন, তখন সকল প্রয়াসের মধ্যে ভাসারীর লাইভ অফ দ্য রেনেসাঁস পেইন্টার্স'-এর একটা জলছবি কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কেমন যেন ফুটে বেরিয়ে আসতে চায়।

এ দেশের চিত্রকলার আলোচনা-সমালোচনার ধারাটি বলতে গেলে একেবারেই অর্বাচীন এবং সেকারণেই গভীরতা বিবর্জিত। অজন্তাগুহাগাত্রের আশ্চর্য ছবিগুলো কারা এঁকেছিলেন, প্রশ্ন করলে গুহার অভ্যন্তরে সে প্রশ্ন শুধু ধ্বনি-প্রতিধ্বনি রচনা করে, কোনো জবাব টেনে আনে না। তাজমহলের স্থপতি কে বা কারা? এ ব্যাপারেও একরাশ মৌনতা চারপাশ থেকে ছুটে এসে প্রশ্নকারীর কণ্ঠস্বর গ্রাস করে ফেলে- জবাব মেলে না। ভারতীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যকলার স্রষ্টারা মা-মাকড়সার মতো। হাড়-মাংস-অস্থি-মজ্জা সবটুকু ক্ষয় করে বাচ্চা ফুটোনোর কাজে। যখন বাচ্চা ডিম ফুটে বেরোল পেঁয়াজের খোসার মতো ফুরফুরে একখানি কঙ্কাল ছাড়া আর কোথাও মায়ের কোনো চিহ্ন নেই। ছবি আঁকা হয়ে গেলে, ভাস্কর্য গঠিত হওয়ার পরে শিল্পীর আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাই অজন্তাতে হোক, ইলোরাতে হোক, তাজমহলে, কুতুব মিনারে, রাজপুত চিত্রে, কানাড়া চিত্রে, মোগল চিত্রে যিনি শিল্পী তিনি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, তার নাম-ধাম কুল-পরিচয় কেউ জানে না।

ইউরোপীয় আদর্শে নব্য-চিত্রকলার বিকাশ ঘটলেও যথার্থ অর্থে চিত্র সমালোচনার ধারাটি এখানে অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। এখানে এক ধরনের সমালোচনার চল আছে, তা যে একেবারে অন্ধ তাও নয়। এমন পারঙ্গম চিত্র ভাষ্যকার যথেষ্ট ছিলেন, বা এখনো আছেন যারা উৎকৃষ্ট চিত্রের মর্মোপলব্ধি করতে পারেন, শিল্পীর প্রাতিস্বিকতা অনুভব করতে পারেন রঙ-রেখার আঁকাবাঁকা বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান করে তুলতে পারেন, বিমূর্ত চিত্রের মধ্যে অর্থের ব্যঞ্জনাও আবিষ্কার করতে পারেন। তার পরেও কিন্তু একটা ফাঁক থেকে

যায়। শিল্প আর শিল্পীর মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক, জৈবিক এবং সক্রিয় সম্পর্কসূচক চিত্র-আলোচনার ধারা এখানে আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। আমাদের দেশে প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীকে এখনো অনেকটা বিশেষ জাতের, বিশেষ ধাচের উন্নত শ্রেণীর কারিগর হিসেবে বিচার করা হয়। শিল্প থেকে শিল্পীকে আলাদা করে দেখার সনাতন অনীহা কাটতে কাটতেও যেন কাটে না। একজন বিজ্ঞানী যে মেধাশক্তি প্রয়োগ করে একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করেন, যে মেধার বলে পারস্পরিক যুক্তি-শৃঙ্খলার বিন্যাসে একজন দার্শনিক জীবন এবং জগতের নতুন অর্থ খুঁজে বের করেন, একজন উৎকৃষ্ট কবি যেভাবে সনিষ্ঠ মেধাশক্তির প্রয়োগে উপমা-চিত্রকলা-ছন্দ অলংকার সহযোগে আনন্দলোকের দুয়ার উন্মুক্ত করেন, চিত্রকরের দক্ষতাকে কবি-বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের সেরকম সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে বরণ করার মতো মানসিক পরিপক্কতা আমাদের সমাজ অর্জন করতে পারেনি। চিত্র-শিল্পীর প্রতিভার যে কদর আমাদের সমাজে তা অনেকটা দায়ে পড়ে, ঠেকে এবং বাধ্য হয়, কদাচিৎ তা স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

সে যাহোক, শেখ মুহম্মদ সুলতানের চিত্রকর্ম আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই তার জীবন আলোচনা করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ থেকে জয়নুল আবেদীন পর্যন্ত সমস্ত শিল্পীর যে জীবন বৃত্তান্ত আমরা জানি তার সঙ্গে সুলতানের জীবন-বৃত্তের সামান্য মিল কোথাও নেই। অন্য সকল শিল্পীর জীবন এবং তাদের কৃত শিল্পকর্ম একটা ছকে ফেলে বিচার করা যায়। শেখ সুলতানের জীবনকে যেমন তেমনি তার ছবিকেও বিচার করতে হবে অনেকগুলো ছকে ফেলে এবং তার সবগুলো আমাদের মানস-দৃষ্টির সামনে উপস্থিত নেই। সুলতানের জীবন বলতে বড়জোর যা বলতে পারে তা হলো লাল মিয়া নামে

একটি শিশু যশোর জেলার একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে আজ থেকে পঞ্চান্ন কি ষাট বছর আগে জন্ম নিয়েছিল। সেই শিশুটিই এখন শেখ সুলতান নাম ধারণ করে যশোরের সেই কৃষক সমাজে ঝাঁকড়া কেশ দুলিয়ে, নমঃশূদ্র নর-নারীর আদরের গোঁসাই সেজে, অর্ধেক ছন্নছাড়া-লক্ষ্মীছাড়া, অর্ধেক সন্তের বেশে সাপ-শেয়াল ইঁদুর-বেড়াল নিয়ে রঙের সংসার পেতে বসে আছেন।

আজকের দিনে সুলতান বলতে যশোরের যে ঝাকড়া কেশের আউলাঝাউলা মানুষটিকে বোঝায়, যিনি পৌঢ়ত্বের চৌকাঠে বেশকিছুদিন আগে পা রেখেছেন; পুত্র কন্যা-স্ত্রী,সংসারহীন একেবারে একাকী একজন প্রাকৃতিক মানুষ; তিনি যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, উনিশশ সাতাত্তর সালে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীর প্রদর্শনী উপলক্ষে আঁকা এসকল চিত্র-সন্তান ছাড়া তার নামের অমরতা ঘোষণা করার আর কেউ থাকবে না।

কস্তুরী হরিণের মতো আপনার গন্ধের পেছনে আপনি কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর বেগে, প্রাণ প্রবাহের তাপে, হেথা নয় হেথা নয়' নিরন্তর তিরিশটি বছরের ছুটে চলা ঋণ প্রবাহের তাপে খু ন হ জীবনের সমস্ত বেগ, সমস্ত আবেগ যশোরের ভাঙা মন্দিরের দ্বারে দ্বারে, জীর্ণ অট্টালিকার খিলানে-অলিন্দে, তরুলতার সংসারে, পশু-পাখির সমাজে অসহায় শিশুর মতো গৃহ সন্ধান করে চলেছে। জীবন যাকে হেঁচকা টানে গৃহ-সমাজ-সংসারের বন্ধন খসিয়ে শিল্পতীর্থের যাত্রী করেছে, শিল্পের মানস-সায়রের উপকূলেই তো তাকে গৃহ। সন্ধান করে নিতে হয়। এই গৃহের সন্ধান তিনি একবার পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন

উনিশশ একাত্তর সাল। হাজার বছরের পরাধীন বাংলা, প্রাণ-পাতালের অভ্যন্তরে অপরাজেয় সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, দর্পিত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে, ভেতরে থেকে শিউরে শিউরে আগুন বরণ ফণা মেলে জেগে উঠেছিল। বাংলার ইতিহাসের সেই অভাবিত, সেই অচিন্তিত-পূর্ব জাগরণের অরুণ আভায় তার একখানি আশ্রয় নিকুঞ্জের ছায়া দর্শন করেছিলেন শেখ সুলতান, কামান-বন্দুকের হুংকারের মধ্যে গৃহের কল-কাকলী কান পেতে শুনেছিলেন। ইতিহাসের এই থরোথরো কম্পিত জাগরণের মধ্যে তিনি ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন: সমাজের উপরতলার শ্রেণীগুলো, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে যারা ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তা দিতে দিতে উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কহীন পরগাছার মতো ফাঁপানো-ফোলানো জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, এই সামাজিক ভূমিকম্পে তাদের অস্তিত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, সময়ের প্রখর তাপে তারা মোমের পুতুলের মতো গলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই কম্পনের বেগ ধারণ করা তাদের সাধ্যের বাইরে। এই জাগরণের আগ্নেয় সংবাদ বহন করতে গিয়ে তারা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। পাশাপাশি আরেকটি শ্রেণীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, প্রকৃতি এবং ইতিহাসের গভীর অঙ্গীকার যারা নিরবধিকাল ধরে বহন করে চলেছে, নতুন ফুটন্ত ইতিহাসের আবেগ-উত্তাপ সবটুকু পান করে ফুটে উঠবার বীর্য এবং বিকাশমান সৃষ্টিশীলতা যাদের আছে। সেই শ্রমজীবী কিষাণ জনগণকে তিনি বাংলার ইতিহাসের নবীন কুশীলব হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। এই দেখা সমাজ-বিজ্ঞানীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামাজিক সম্পর্কের জটাজাল বিচার নয়, অর্থশাস্ত্রীর চুলচেরা শ্রেণী-বিশ্লেষণ নয়। এ দেখা শিল্পীর দেখা: বিন্দুতে সিন্ধু ঝিলমিলিয়ে ওঠে, ক্ষুদ্র তিল পরিমাণ বীজকণার অন্তরে সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়ে শায়িত থাকে বিশাল মহীরুহ।

তাই সুলতানের কৃষক, জয়নুল আবেদীনের কৃষক নয়। জয়নুল আবেদীনের কৃষকেরা জীবনের সংগ্রাম করে । সুলতানের কৃষকেরা জীবনের সাধনায় নিমগ্ন । তারা মাটিকে চাষ করে ফসল ফলায় না। পেশীর শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গম করে প্রকৃতিকে ফুলে-ফসলে সুন্দরী সন্তানবতী হতে বাধ্য করে। এইখানে জীবনের সংগ্রাম এবং সাধনা, আকাক্ষা এবং স্বপ্ন আজ এবং আগামীকাল একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছে। সুলতানের কৃষকেরা নেহায়েত মাটির করুণা কাঙাল নয়। রামচন্দ্র যেমন অহল্যা পাষাণীকে স্পর্শ করে মানবী রূপ দান করেছিলেন, তেমনি তার মেহনতি মানুষদের পরশ লাগামাত্রই ভেতর থেকে মাটির প্রাণ সুন্দর মধুর স্বপ্নে ভাপিয়ে উঠতে থাকে। এ মানুষগুলো পাখা থাকলে দেবদূতের মতো আকাশের অভিমুখে উড়াল দিতে পারত। কিন্তু একটি বিশেষ ব্রতে, একটি বিশেষ অঙ্গীকারে আবদ্ধ বলেই তারা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে আছে। সে অঙ্গীকারটি, সে ব্রতটি মাটিকে গর্ভবতী ও ফসলশালিনী করা। মাথার উপরে স্বর্গলোকের যা কিছু প্রতিশ্রুতি, যা কিছু প্রেরণা তার সবটুকু- আকাশের নীল থেকে, রামধনুর বর্ণের সুষমা থেকে হেঁকে এনে মাটির ভেতরে চারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই মানুষ-মানুষীর দল। ম্যাক্সিম গোর্কির সেই বাক্যটি কি দর্পিত, কি ব্যঞ্জনাময় এই মানুষ শব্দটি' উচ্চারণ মাত্রই নিসর্গের অন্তরে কি ব্যাকুল সাড়া এবং কানাকানি পড়ে যায়। সুলতানের আঁকা এই কৃষকদের যিনি দেখেছেন, অবশ্যই একমত হবেন, ম্যাক্সিম গোর্কির মানুষ সম্পর্কিত মন্তব্য কত সার্থক এবং যথার্থ হয়েছে ।

ইতিহাসের অয়নান্তকালে একটি নতুন শ্রেণী সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে নতুন ঐতিহাসিক বলে বলীয়ান হয়ে, নতুন সামাজিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন জাগ্রত হয়; শিল্পকলাতে সে সমাজের ব্যক্তি-স্বরূপের অভিব্যক্তি যখন ঘটতে থাকে, তখন ব্যক্তি ব্যক্তিমাত্র থাকে না, জাগরণশীল নিখিলের অংশ হয়ে যায়। রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের মধ্যে একবার জাগরণশীল নয়া নিখিল পুরনো চরাচরের নাগপাশ ছিন্ন করে মূর্তিমান হয়েছিল। দেবতা এবং দেবলোকের নষ্ট-অপচিত স্বপ্নের অশরীরী সৌন্দর্যের মায়াকাননের বলয় গ্রাস থেকে চিন্তা কল্পনাকে মুক্ত করে প্রাকৃতিক নিয়ম শাসিত এই পৃথিবীর দিকে এবং সমস্ত সুন্দরের নিবাসভূমি এই দেহ-দেউলের প্রতি বিস্ময়াপুত নয়ন মেলে অগ্রপথিক মানুষেরা যখন নয়া মানব বিজ্ঞানের প্রসাদে, সম্ভাবনা স্পন্দিত অন্তরে তাকাতে আরম্ভ করেছে; সেই দেখার আবেগ, প্রত্যাশাই রেনেসাঁস যুগের শিল্পীদের শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

শরীরী সৌন্দর্যের প্রতি এই গভীর অনুরাগ, সুন্দর এবং শক্তির এই যুগল সম্মিলন রচনার কৌশল সুলতানের রেনেসাঁস শিল্পীদের কাছে শেখা। ভাগ্যবশত রেনেসাঁস শিল্পের পীঠস্থানসমূহে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ তার হয়েছিল। পুরনো দেবতারা যেমন মরে না, পুরনো শিল্পও তেমনি অমর। গ্রিসের রঙ্গমঞ্চ যখন শুধু একটা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে, দেবী অ্যাথেনীয় মন্দির যখন একটা পাথুরে কঙ্কালমাত্র, ভাস্করের খোদাই করা রস লাবণ্যমাখানো মূর্তিসমূহ খোঁড়া-অন্ধ-বিকলাঙ্গ, কালের প্রহার অঙ্গে ধারণ করে সময়-সমুদ্রেবিলীন গরীয়ান গ্রিক সভ্যতার যৌবন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দর্শকের বুকে একটু করুণা একটা দীর্ঘশ্বাস জাগাবার জন্য দিবস-রজনী, মাস-

বছর, যুগ-যুগান্ত প্রতীক্ষা করছে; সেই সময়ে খ্রিস্টধর্মের বর্বরতাঠাসা আদিম অন্ধকার থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় 'আলো আলো' বলে চিৎকার করছে তামাম ইউরোপ। আলো চাই, আরো আলো চাই। টলেডো, কর্ডোভা, গ্রানাডার মূর পণ্ডিতেরা অঙ্গুলি সংকেতে দিক নির্দেশ করল; যাও গ্রিসে যাও। আলো জ্বালানোর কৌশল শিখতে চাও তো গ্রিক লেখকদের লেখা পড়ো, তাদের ধ্যানের দীপ্তি, মননের ঐশ্বর্য অন্তরে ধারণ করো।

ইহজাগতিকতা বা সেকুলারিজম, যার অর্থ এই জগৎ সুন্দর, এই জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, সমস্ত কর্ম, সমস্ত অভিব্যক্তি সুন্দর। প্রাচীন গ্রিস বার্ধক্যের জীর্ণতার ভারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেও তার হৃদয়ে এই অবিনাশী সৌন্দর্যের প্রেরণার ঝর্নাধারা, এই ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে, এই মৃত্যুহিম শীতলতার গভীরে এখনো উষ্ণস্রোতে প্রবহমান। ইউরোপে সে কি উৎসবের সাড়া। দলে দলে বলাকারা যেমন মানস-সরোবরের সন্ধানে যায়, ইউরোপের আলোকিত আত্মারা প্রাচীন অ্যাথেন্স নগরীর অভিমুখে মানস যাত্রা রচনা করল। রব উঠল গ্রিকদের মতো চিত্র আঁকতে হবে, ভাস্কর্য গড়তে হবে, নাটক লিখতে হবে, খ্রিস্ট ধর্ম যেসব একান্ত মানবিকবোধের মুখে পাথর চাপা দিয়েছে সে সমস্ত অর্গল টুটিয়ে দিয়ে একান্ত জৈবিক অনুভূতিসমূহও থরে থরে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই ফোঁটার কাজ শিল্প-সাহিত্যে, চিত্রে-ভাস্কর্যে, বিজ্ঞানে-দর্শনে এমনিভাবে ঘটেছে সৃজন-ঋতুর কল্পনা করামাত্রই মন এক লাফে রোম, ভেনিস, জেনোয়া- এসকল নগরীর দিকে যাযাবর বিহঙ্গের মতো ছুটে যেতে চায়।

শেখ সুলতানের মধ্যে দ্যভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর প্রকাণ্ড কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এত গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে এ চিত্রসমূহ, কোনোরকমের মধ্যবর্তিতার বালাই ছাড়া, সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে এই উনিশশ সাতাত্তর সালে বাংলাদেশের কৃষক সমাজে এসে নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলো আঁকার মতো মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য শেখ সুলতানকে সব দিতে হয়েছে। পরিবারের মায়া, বংশধারার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রবাহিত করার স্বাভাবিক জৈবিক আকাঙ্ক্ষা ভেতর থেকে ছেটে দিয়ে, এই চিত্র-সন্তান জন্ম দেয়ার একাগ্রপ্রায় কাঁপালিক সাধনায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে সারা জীবন। শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়েছে। বাংলার শিল্পীর হাত দিয়ে বাংলার প্রকৃতি এবং বাংলার ইতিহাসের একেবারে ভেতর থেকে রেনেসাঁস যুগের ফুল ফুটেছে। সুলতানের সাধনা মিথ্যা হয়ে যেত, যদি না বাংলার শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতা করে একটি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে ইতিহাসের জাগ্রত-দেবতা আপন স্বরূপে শিল্পীর সামনে এসে না দাঁড়াতেন।

এইখানেই সুলতানের অনন্যতা। এইখানেই বাংলার কোনো শিল্পীর সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো শিল্পীর সঙ্গে সুলতানের তুলনা চলে না। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, নন্দলাল, জয়নুল আবেদীন, আবদার রহমান চাঘতাই, নাগী, এসকল দিকপাল শিল্পীর মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক, তবু সকলের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র অবশ্যই রয়ে গেছে। হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পাদর্শের যে ব্যাপক সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, কেউ তার আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি- একমাত্র সুলতান ছাড়া । বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন যখন

মহাকাব্য লিখেছেন, তার বহু আগেই ইউরোপে মহাকাব্য লেখার কাজ চুকেবুকে গেছে। কিন্তু মধুসূদন মহাকাব্য লিখলেন বাংলা ভাষায়। মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য বাংলার সাহিত্য, গগনে সূর্য-সংকাশ দীপ্তি নিয়ে, অনন্যতার নিদর্শন হয়ে মানব কল্পনার কুতুবমিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অতিকায় কল্পনার বোঝা আরো অধিক বহন করবার জন্য তার স্বগোত্রীয় কবিকুলের মধ্যে দুচারজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মালেও ক্ষমতা কারো যে ছিল না, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুলতানের এই চিত্রগুলোও অনেকটা সে গৌরবে গরীয়ান।

শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন মাহেন্দ্রক্ষণের হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে যখন গোটা ইতিহাসের ধারাটাই শিল্পীর চেতনালোকে মাতম করে ওঠে। সেই বিশেষ সময়টিতে নিসর্গের স্কুল-চিকন দৃষ্টি-অগোচর কার্যকারণ সম্পর্কের সম্পূর্ণ সূত্রটাই শিল্পী-চেতনার মুকুরে এমনভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই গহন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় স্বভাব সম্বন্ধে শিল্পীর নিজেরও কোনো স্বচ্ছ, যুক্তিনিষ্ঠ ধারণা থাকে না। তা থাকা সম্ভবও নয়, আর শিল্পীর জন্য প্রয়োজনও নয়। এই একান্ত সংগোপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দোলা, যার আবেশে শিল্পী সব ভুলে শিল্প-কর্মে মনোনিবেশ করে, তার সহজ নাম প্রেরণা। প্রেরণার স্পর্শ না পেলে কিছুই নির্মাণের স্তর অতিক্রম করে শিল্পকর্মের ব্যঞ্জনা লাভ করে না। আবার সব শিল্পীর প্রেরণার ধরনও এক নয়। প্রেরণা নিজের অস্তিত্বকে পুড়িয়ে অন্যরূপে রূপান্তরিত করার সুন্দর সুখকর আনন্দ-বেদনাদায়ক অনুভূতি। এই অনুভূতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ, বিভিন্ন রসে আত্মপ্রকাশ করে। কোনো বিশেষ সময়ে স্নিগ্ধ রঙ, শান্ত রস, কোনো সময়ে উজ্জ্বল চড়া খুনখারাবীর মতো রঙ

আর ভয়ংকর রস প্রাধান্য পায়। সময়ের বৈশিষ্ট্যের মতো শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ভেদেও একেক রঙ একেক রস মুখ্য হয়ে ওঠে। কোনো শিল্পী স্নিগ্ধ রঙের, শান্ত রসের, কোনো শিল্পী মধুর রসের আর চিত্তহারী রঙের কোনো শিল্পী হাল্কা ফুরফুরে তুলিতে হাল্কা রস বিকশিত করতে পারেন। রাগ সঙ্গীতের মতো। যেমন সব রাগ সকলের কণ্ঠে সমান খেলে না। শিল্পে যুগ-বিভাগ অর্থাৎ একেক যুগের শিল্পের প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহকে সাধারণ লক্ষণ ধরে নিয়ে এক যুগের শিল্পকর্মকে অন্য যুগের চাইতে আলাদা করার একটা প্রচলিত পদ্ধতি আছে, তাতে সময়ের রঙ এবং রসের ব্যাপারটিকেই নির্ণায়ক হিসেবে ধরা হয়। শিল্পীর ক্ষমতা এবং যোগ্যতায় যত আকাশ-পাতাল ফারাক থাকুক

কেন, একই সময়ের সৃষ্ট নানা শিল্পের মধ্যে একটা সাধারণ, ব্যাপ্ত লক্ষণ অবশ্যই ধরা পড়বে। প্রাক-রেনেসাঁস চিত্রের একটা সাধারণ, সহজে চেনা যায় এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে রেনেসাঁস, উত্তর-রেনেসাঁস, ইম্প্রেশানিস্ট, ইমেজিস্ট, সুররিয়ালিস্ট প্রতিটি যুগের শিল্পের আলাদা আলাদা কতেক সাধারণ ধরন।

কোনো কোনো শিল্পীর চেতনায় ইতিহাসের অন্তর্লীন সূত্রটি রক্তশিখায় জ্বলে ওঠে, মাদল ধ্বনিতে বেজে ওঠে। কেন? কেন আতশকাঁচ সূর্যের সামনে ধরলে আগুন জ্বলে, সাধারণ কাঁচ জ্বলে না কেন? সেরকম কোনো কোনো জাতের শিল্পী আছে উপযুক্ত সমিধ পেলে চেতনায় গোটা ইতিহাসের ধারাটিই জ্বালিয়ে তুলতে পারেন। এটি একটি দেবদুর্লভ ক্ষমতা। যার আসে এমনিই আসে। ইতিহাস যাকে মনোনীত করেন, অনেক দুঃখ নিয়েই যোগ্য করে তোলেন। অনেকে আবার দুঃখ সহ্য করেন বটে কিন্তু শিল্প-সৃজনলোকে

নির্বাণ লাভ করতে পারেন না, এ-ও ঘটে। তুলনা করলে দেখা যাবে শিল্পতীর্থের অভিযাত্রী হাজার হাজার জনের মধ্যে কৃচিত কখনো দুয়েকটি প্রাণ সেই অমরলোকে সশরীরে হাজির হতে পেরেছে।

তান্ত্রিক সাধনার মতো শোনাবে। শিল্প-সাধনা আসলে একধরনের তান্ত্রিক সাধনারই ফলিত প্রকাশ রূপ। কথাটা শুনলে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রয়োগ করে বিষয়টি বিচার করলে সে ভুলটা অতি সহজে ঘুচে যাবে। তান্ত্রিক বাউল এমনকি সুফি সাধকেরাও বিভিন্নভাবে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রণ করে ঊর্ধ্বায়িত করার সাধনা করেন। শিল্পীর কাজও অনেকটা সেরকম। তবে তিনি সজ্ঞানে বোধ করতে চান না যে সে সাধনাটিই তিনি করছেন। শিল্পী একটা বিশেষ ছবি আঁকতে চান, কবিতা লিখতে চান, তাতে মনের বিশেষ ভাব-অনুভাবগুলো জ্বালিয়ে তুলতে চান। এই বিশেষ ছবি আঁকতে গিয়ে, বিশেষ কবিতা লিখতে গিয়ে তাকে সর্বপ্রথম নিজের অস্তিত্বের বিপক্ষে যেতে হয়।

হয়তো অস্তিত্বের বিপক্ষে যাত্রা করেও আরেকটি অস্তিত্ব কেউ কেউ আবিষ্কার করেন। সমাজ যদি এই বৃহত্তর অস্তিত্ব অভিমুখে যাত্রার পথ করে না দেয়, শিল্পীর সংবৃদ্ধি এবং পরিবৃদ্ধির সেখানেই ইতি। শিল্পীকে সমাজের নানাকিছুর মধ্যে দিয়েই পথ কেটে বয়ে যেতে হয়। শিল্পী যা-ই কিছু সৃষ্টি করেন, তার গোটা সৃজন-ক্রিয়ার মাধ্যমে আপন অন্তর্নিহিত চেতনার সামাজিক রূপান্তর সাধন করেন। শিল্পীর আপন অন্তরকে বাইরে টেনে আনার এই যে পদ্ধতি তার স্বরূপটিও দ্বান্দ্বিক। বাছুর যেমন ডুস দিয়ে গাভীর

ওলান থেকে দুধ বের করে আনে, কিছুটা তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতসমূহও শিল্পীর চেতনায় নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর শিল্পের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি প্রকাশরূপ লাভ করে।

এইখানেই একজন শিল্পীর সঙ্গে একজন তান্ত্রিক সাধক, বাউল বা সুফি-সাধকের পার্থক্য। গোটা সমাজের দিকে পিঠ দিয়ে গহন বনে, জনতার অগম্য অরণ্যে সাধক গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন, সমাজের কথা না ভাবলেও চলে। অন্তরের মর্মরিত স্পন্দনের গভীর আবেগে সর্ব অস্তিত্ব সমর্পণ করতে পারলেই তিনি প্রকৃত সাধকের শিরোপা লাভ করেন। সাধকের চেতনা নিজের ভেতরে আবর্তিত হয়, আর শিল্পীর চেতনা সমাজকে আলোড়িত-বিলোড়িত করে। যদিও দুয়ের মধ্যে জল-অচল এরকম কোনো নিরেট পাথুরে প্রাচীরের ব্যবধান নেই। প্রায়ই বড় শিল্পী প্রকৃতিতে কিছুটা সাধক। এবং সাধকেরাও প্রকৃতিতে কিছুটা শিল্পী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

চেতনার উর্ধ্বে উড্ডীন অবস্থা থেকেই শিল্পের সৃষ্টি। সমাজে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলতে গিয়ে শিল্পী নিজেও কিছুটা আউট-সাইডার হয়ে পড়েন। অর্থাৎ সমাজের কার্যকারণ সম্পর্কে সুগ্রথিত চেতনাস্তর থেকে অন্য একটি কল্পিত স্তরে নিজেকে টেনে তুলতে হয়। এই টেনে তুলতে গিয়েই শিল্পী সমাজের সঙ্গে কেজো সম্পর্কটি হারিয়ে বসেন। তখন শিল্পকলাই সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের একটা কৃত্রিম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সমাজটির চেতনাও যদি আনুপাতিক হারে শিল্পীর চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে তাহলে শিল্পীকে দুটি পরিণতির একটিকে বেছে নিতে হয়। হয়তো তাকে

আত্মধ্বংসী কোনো প্রবণতাকে আমন্ত্রণ করে আনতে হয়, নতুবা তান্ত্রিক বা বাউল কিংবা অন্য কোনো সাধকের পথ ধরতে হয়। বলা বাহুল্য, এ দুটোই শিল্পীর শিল্প-সত্তার প্রেতরূপ। শিল্পীর চেতনার গতি যদি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় আর সমাজের চেতনার গতিটি যদি থাকে গাণিতিক, সেখানে শিল্পী-চেতনার সঙ্গে একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। বড় শিল্পী, বড় কবি, বড় লেখকদের জীবনের চেতনার এই বিস্রস্ত অগ্রথিত সময়কে বলা হয় মানস সংকট কাল।

এমনও দেখা যায় কোনো কবি কোনো শিল্পী জীবদ্দশায় একজনও সহৃদয় হৃদয় সংবেদী পাঠক বা দর্শক পেল না। দেখা গেল মৃত্যুর পরে তার লেখা কবিতা বা আঁকা ছবি নিয়ে সমাজে বেশ মাতামাতি চলছে। উদাহরণস্বরূপ বোদলেয়ারের কথা বলা যেতে পারে। বোদলেয়ার তার জীবদ্দশায় একেবারে অনালোচিত থেকে গেছেন। জীবনানন্দ দাশ ট্রামের তলায় পড়ে মারা গিয়েছিলেন, সে সংবাদটিও ভাল করে কাগজে ছাপা হয়নি। এটা কেন ঘটে- ঘটে একারণে যে শিল্পী বা কবির চেতনা ঋদ্ধি-সমৃদ্ধি লাভ করেছে, এবং শিল্পের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে; কিন্তু সে হারে সমাজের নাড়ি চঞ্চল হয়ে ওঠেনি; তাই সমাজের বুকে কোনো সাড়া, কোনো চঞ্চলতা জাগছে না। পরে যখন সমাজ সাড়া দেয়ার শক্তি অর্জন করেছে তখন হয়তো দেখা যাবে শিল্পী বেঁচে নেই। অনাত্মীয় সমাজের দ্বারে দ্বারে হৃদয়ের অর্ঘ্য সাজিয়ে কত কবি শিল্পী যে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন, শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের কি অভাব আছে? সুতরাং কোনো কোনো কবি, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী দার্শনিককে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই আউট সাইডারই থেকে যেতে হয়। দুই কারণেই শিল্পী আউটসাইডার হয়ে পড়েন।

চেতনার প্রচণ্ড উল্লম্ফন প্রক্রিয়ার অভিঘাতে কেউ কেউ আউটসাইডার হয়ে পড়েন, আবার কেউ প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে কোনো সহায়ক ভিত্তি না থাকার দরুন আউটসাইডার হয়ে পড়েন। শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলা হলো একারণে যে শেখ মুহম্মদ সুলতান তার জীবনের আদি, মধ্য, এমনকি হালের অন্তপর্বেও এই আউট সাইডারের জীবন যাপনই করে যাচ্ছেন।

কোনো কোনো মানুষ জন্মায়, জন্মের সীমানা যাদের ধরে রাখতে পারে না। অথচ তাদের সবাইকে ক্ষণজন্মাও বলা যাবে না। এরকম অদ্ভুত প্রকৃতির শিশু অনেক জন্মগ্রহণ করে জগতে, জন্মের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যাদের রয়েছে এক স্বাভাবিক আকুতি। তাদের সকলের জন্মে জন্মান্তর ঘটে না। কোটিতে গুটি হয়তো মেলে, যারা জন্মেই জন্মান্তরের নির্বাণ লাভ করে। জীবনের দেবতা আপনি এগিয়ে এসে তাদের প্রাণের দেহলীতে সে আশ্চর্য পিদিম জ্বালিয়ে দিয়ে যান। সৌভাগ্য হোক, দুর্ভাগ্য হোক এ সকলের হয় না। শেখ মুহম্মদ সুলতান সে সৌভাগ্যের বরে ভাগ্যবান, আবার সে দুর্ভাগ্যের অভিশাপে অভিশপ্ত ।

সুলতান ওরফে লালমিয়ার জন্ম যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার একটি কৃষক পরিবারে। কৃষি ছাড়াও তার বাবা বছরের অকর্মা মাসগুলোতে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য করতেন রাজমিস্ত্রির কাজ। রাজমিস্ত্রি গ্রামীণ সমাজের পেশা বিচারে একটি বিশিষ্ট কর্ম ।

সে যাক, উত্তরাধিকারসূত্রে বিচার করলে বড় জোর এটুকু বলা যেতে পারে, রাজমিস্ত্রি শিল্পী পিতার কাছ থেকেই লালমিয়ার মনে অপূর্ব বস্তু-নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু সেটাও সবার কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হবে, তেমন বলার উপায় নেই। সে যাহোক, শিশু লালমিয়া সুযোগ পেলেই কাঠ-কয়লা দিয়ে ছবি আঁকত, রঙ পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু রঙ পাবে কই? তাই সে কাঁচা হলুদ আর পুঁই গাছের ফলের রস টিপে টিপে ছবি আঁকত। একদিন লালমিয়ার আঁকা এসকল ছবি স্থানীয় জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে। জমিদার মশায় খুবই অবাক হয়ে যান। তিনি লালকে ছবি আঁকার কিছু রঙ কিনে দেন এবং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে তার পড়াশোনা কতদূর হয়েছিল, বিশদ জানা যায়নি। তবে এটুকু সত্য যে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করার আগেই লালমিয়া পালিয়ে কলকাতা চলে যায়।

কলকাতাতেই কিভাবে জানা যায়নি কলা-সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর চোখে পড়ে কিশোর লালমিয়ার ছবি। তিনি তাকে বাসায় নিয়ে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেন, জামা-কাপড় কিনে দেন এবং নির্ধারিত যযাগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সুপারিশ করে আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তার নামান্তর ঘটে যায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব লালমিয়ার নতুন নামকরণ করলেন শেখ মুহম্মদ সুলতান। এই নামান্তর ঘটিয়েই জন্মান্তরের একটি ধাপ পার করে দিলেন। আর্ট স্কুলেও তার আঁকাবুকির পালা সাঙ্গ হবার আগে লালমিয়া ওরফে সুলতান আরো একবার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন, রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের সে সুকুমার স্নিগ্ধকান্তি কিশোরটির মতো । অযাচিতভাবে পাওয়া আদর-যত্ন বিত্ত-বৈভব এবং ভাবী স্ত্রীর মায়া পরিত্যাগ করে বিয়ের দিন সে কাউকে না বলে শ্বশুর বাড়ি

ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার গ্রামের লালমিয়া পালিয়ে শহর কলকাতায় এসেছিল। দ্বিতীয়বার শহর কলকাতা ছেড়ে কন্যা-কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত গোটা ভারতবর্ষ অভিমুখে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর মতো একজন স্নেহশীল অভিভাবকের আশ্রয়, সোহরাওয়ার্দী পরিবারের গরিমা কিছুই সুলতানকে আটকে রাখতে পারেনি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। সুলতান পাঁচ-দশ টাকার বিনিময়ে গোরা সৈন্যের ছবি আঁকছে, আর ভারতের শহর থেকে শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়-ভাবনা নেই, দায় দায়িত্ব নেই, আছে শুধু সুন্দরের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ আর ছুটে চলার গতি। এ সময়ে আঁকা ছবিগুলোর কি হয়েছে, কোথা থেকে কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারে না। ভারতবর্ষের নানা শহরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলোর বিলম্বিত সংবাদ আজ বুকে শুধু দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেবে। অনুমান করারও উপায় নেই, সে সময়ে তার অঙ্কনশৈলী কি রকম ছিল; সময়ের এবং বয়সের ব্যবধানে কতদূর বিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়েছে অঙ্কনরীতি, বোধ এবং উপলব্ধি।

তারপরে ভারত তো ভাগ হলো। সুলতান এলেন পাকিস্তানে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর-করাচীতে অবস্থান করার সময় কখনো ঘর বাঁধার স্বপ্ন এ ঘরছাড়া মানুষটির মনে ঘনিয়ে এসেছিল কিনা, সে অন্তর্গত সমাচার দেয়া রীতিমতো দুঃসাধ্য। সুমা-আঁকা কাজলটানা কোনো রমণীর ব্রীড়াভঙ্গি তাকে চঞ্চল এবং উতলা করেছিল কিনা, বলতে পারব না। তেমনি করতে পারব না ছবির সম্পর্কে কোনো মন্তব্য। এ সময়ে তিনি বিমূর্ত রীতিতে নাকি দেদার ছবি এঁকেছেন । পরী-কন্যার স্তনের গল্পের মতো কেবল গল্পই শুনব। কোনোদিন চোখে দেখতে পাব না। তৎকালীন পশ্চিম

পাকিস্তানে তার অনেক প্রদর্শনী হয়েছে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সে সকল প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন, সংবাদপত্রের প্রশংসা প্রশস্তির সবটুকু হারিয়ে যায়নি। নানা সাময়িকীর কল্যাণে দুয়েকটার মুদ্রিত ব্লকও হয়তো সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। সেগুলো তো আর ছবি নয় । ছবির ছবি। সুতরাং কোনো সুচিন্তিত মন্তব্য করা অসম্ভব ।

বিলেতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ছবিগুলো সম্পর্কেও আমরা একইরকম অন্ধকারে থেকে গেছি। যদিও 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় উষ্ণ আলোচনা থেকে অনুভব করতে পারি ছবিগুলো ভাল হয়েছিল এবং দর্শকেরা প্রাণভরে উপভোগ করছিলেন। কিন্তু আসল ছবি যেখানে অনুপস্থিত সেখানে কি কোনো কথা চলে? মন্তব্যগুলো শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিলেতের পর আমেরিকা। সেখানেও সুলতান ছবি এঁকেছেন, সে ছবিগুলো কে কিনেছে, কোথায় কিভাবে আছে, অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে না হারিয়ে গেছে, কার কাছে জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাওয়া যাবে জানি না। এখানেই নিরুদ্দেশ যাত্রার ইতি। অন্ন চল্লিশ বছরের জীবনের একটানা ছুটে চলা ঘরবিরাগী জীবনের সম্পর্কে কোনো গহন কথা আমরা যেমন উচ্চারণ করতে পারব না, তেমনি তার এ সুদীর্ঘ কালের আঁকা ছবির উপর কোনো বক্তব্য রাখতেও পারব না। তাবৎ কলা-সমালোচকের মনে সুলতানের এ-পর্যায়ে আঁকা ছবিগুলো একটা অতৃপ্ত কৌতূহল এবং একটা আফসোসের বিষয় হয়ে থাকবে। সুতরাং সুলতান বলতে যশোরের গগ্রামনিবাসী, মুসলমান চাষী এবং নমঃশূদ্র জীবনের একান্ত শরিক এই মানুষটিকেই চরম ও পরমভাবে মেনে নিতে হবে। তার জীবনের যেন কোনো সূচনা নেই, শৈশব-নেই, কৈশোর নেই, হঠাৎ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের ভেতর থেকে একরাশ কাঁচাপাকা বাবরী চুল দুলিয়ে জেগে উঠেছেন। তার

ছবির সম্পর্কেও একই কথা। এ ছবিগুলোও অতীতের একেবারে কোলঘেঁষা অন্ধকার ভেদ করে দলে দলে জগৎ-সংসারের কাছে এই মানুষ, এই সভ্যতা, এই সমাজ, এই ইতিহাস এবং এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের বার্তা প্রেরণ করবার জন্য যেন আচমকা কার মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বানে ছুটে এসেছে।

এই যুদ্ধ এই জাগরণের একটা উল্লসিত বার্তা তো ছবিগুলোর মধ্যে আছে হাজার হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে একটা জাতি প্রাকৃতিক সত্যের মতো জেগে উঠেছে, শিল্পীর তুলিতে যখন এ জাগরণ-বৃত্তান্ত মূর্তিমান হয়, সে প্রবল প্রাণস্পন্দন ঝংকারিত না হয়ে কি পারে? কিন্তু পাশাপাশি একটা বেদনার দিক আছে। সুলতানের আঁকা একটা ছবি আছে, যা তিনি প্রদর্শনীতে হাজির করেননি। ছবিটির নাম 'বিপ্লব'। একেক জন শক্ত-সমর্থ মানুষ আপন হাতে তার মস্তক ছিঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে দিচ্ছে। নিজেই নিজের হাত ভেঙে ফেলছে, পা মচকে দিচ্ছে। প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের ফলে যে বিপ্লবী শক্তি মুক্তি পেয়েছে, তা যে কি রকম আত্মঘাতী রূপ নিতে পারে এই ছবিটিতে তার সবটুকু বিধৃত রয়েছে। আজকের বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সুলতানের এ ছবিটিই যথেষ্ট। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি কোনো বিষয়ের অবতরণার প্রয়োজন নেই।

সুলতান নিরুদ্দেশ যাত্রা অন্তে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বোধকরি উনিশশ চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন সাল। ঢাকাতে জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে একটি চিত্রপীঠ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সুলতানের কোনো ঠাই হলো না। কারণ অতিশয় স্পষ্ট,যে নতুন মধ্যবিত্তটি

সবেমাত্র জেগে উঠছে এবং শিল্প-সাহিত্যের নানাদিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পথযাত্রা শুরু করেছে, তার মানস অতিশয় সংকীর্ণ, রাজনৈতিক লক্ষ্য অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন, শিল্প-সংস্কৃতির কোনো গভীর উপলব্ধিতে রঞ্জিত হয়নি তার মানস পরিমণ্ডল । স্নিগ্ধতার বদলে উগ্রতা, উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, স্কুল আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্মর মোহ তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে কোনো বিকশিত চেতনার প্রতি প্রণত হওয়া তার ধাতের মধ্যেই স্থান পেতে পারেনি। সুলঅনের কলেজের সার্টিফিকেট নেই এটা উপলক্ষ মাত্র। এমনিভাবে এ শ্রেণী সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো সাহিত্যের একজন দিকপালকেও দেশের বাইরে ছুঁড়ে দিতে সামান্য দ্বিধান্বিত হয়নি। মুজতবা আলীর ক্ষেত্রেও উপলক্ষের অভাব ঘটেনি। আসলে সে সময়টাই ছিল এমন: বাংলাদেশের মধ্যবিত্তটি তার ফিলিস্টিন মানসিকতার কারণে যা কিছু তার জাগতিক অধিকারবোধের বিপক্ষে যায় তার বিরোধিতা করেছে এবং প্রদর্শন করেছে অসহিষ্ণুতা।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্টরেট ডিগ্রি ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ ছিল, আর বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক সমাজ ছিল, সর্বোপরি সমাজের উপরতলায় একটা স্থায়ী আশ্রয় ছিল। তাই তিনি নির্বিবাদে ফিরে যেতে পারলেন বিশ্বভারতীতে এবং সেখানে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হলেন। কিন্তু সুলতান? তিনি তো আপন পরিচয়ের সূত্র আপন হাতে কেটে দিয়ে সমাজ এবং সময়ের স্রোতের ভেতর দিয়ে কেবল বয়েই গেছেন। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত কোনো সমাজেই গৃহীত হওয়ার মতো কোনো কিছুই তিনি অর্জন করেননি, না স্ত্রী না পুত্র না স্বভাব-চরিত্র আদব-কায়দা।

বিত্ত-বেসাত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কিছুই নেই, বুকের তলায় উজ্জ্বল আলোকিত চেতনা ছাড়া। তিনি যাবেন কোথায়? বিশ্বভুবনে এমন কে আছে তাকে গ্রহণ করে?

অগত্যা তাকে যেতে হলো সেই বহুকাল আগের ছেড়ে আসা পিতৃ-পুরুষের নিবাসে, সেই কিশোর লাল মিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাঁপড়া করতে হলো। সে কি সোজা কথা- গ্রাম বাংলার লাজুক কিশোরটির সঙ্গে বিশ্ব-পরিব্রাজকের ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ দৃষ্টিবোধের অনুভবের সম্মিলন।

শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব হলো। তবে তার পেছনে সুলতানের সক্রিয় চেষ্টার চাইতে সময়ের ধারার ভূমিকাই অনেক বেশি। যে মধ্যশ্রেণীটি উনিশশ সাতচল্লিশ সাল থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছিল, উনিশশ একাত্তর সালে এসে তাকে চূড়ান্ত অনিচ্ছায় একটা যুদ্ধকে কাঁধে নিতে হলো। কিন্তু শ্রেণীটির দোদুল্যমান জাতীয়তার বোধ দিয়ে না পারল জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটাতে, না পারল অর্জন করতে যুদ্ধের ভার বইবার মতো ঋজু মেরুদণ্ড। এই শ্রেণীর শৈল্পিক প্রতিনিধি জয়নুল আবেদীন তার মনপুরা' শীর্ষক চিত্রমালায় জানাতে বাধ্য হলেন যে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি ক্ষমতার সবটুকু অবসিত। সত্যি সত্যি তার নতুন কিছু সৃজন করার ক্ষমতার আর অবশিষ্ট নেই।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নতুন আরেকটি শ্রেণীর ডাক পড়েছে। কিন্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে সে শ্রেণীটি কোনো আকার লাভ করেনি। মধ্যশ্রেণীর আকাক্ষার সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা পরস্পর বিজড়িত হয়ে রয়েছে, কার লক্ষ্য কোথায় স্থির করা হয়নি। প্রথম শিল্প সাহিত্যেই তার

প্রভাবটা বড় বেশি তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হতে থাকল। বাংলাদেশের পাঁতিবুর্জোয়া লিখতে গিয়ে বোধ করতে থাকল, এই সময়ের উপযোগী গল্প-কবিতা তার লেখনি দিয়ে আর আসছে না। অথচ অতীতের মতো লিখতেও সে পারছে না। ঘটনার অভিঘাত চঞ্চল চেতনাপ্রবাহে ভিন্ন একটা ঢেউ জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা তার নেই। গায়ক অনুভব করল তার কণ্ঠের গানে সময়ের সংবেদনা বেজে উঠছে না। ছবি আঁকিয়েরা অনুভব করল সময়ের খরতরঙ্গের দোলা জাগছেনা তাদের চিত্রলেখায়। সর্বত্র একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। সকলে বুঝতে পারছেন, তাদের অন্যকিছু করা উচিত। কিন্তু সেটা কি স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। এই লজ্জার কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তারা কোলাহল দিয়ে সুরের অভাব, কথার পাশে কথা গেঁথে সাহিত্যের শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টায় অষ্টপ্রহর ব্যস্ত। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। প্রতারকদের সুযোগ দেবে কেন? দোদুল্যমান জাতীয়তার বোধটি আরো দুলিয়ে দিয়ে তাদের নায়ক শেখ মুজিবকে সপরিবারে নিরস্তিত্ব করে দিল সময়। কিন্তু জাতি অর্ধেক ভূমিষ্ঠ হলো, অর্ধেক রয়ে গেল ইতিহাসের জরায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে।

সুলতান শিল্পের জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে জাতির ইতিহাসকে মুক্ত করে দিলেন। আগামীতে যাদের সাধনায় সংগ্রামে বাংলার ইতিহাস পাবে গতি, সেই অনাহারক্লিষ্ট, রোগগ্রস্ত, নজদেহ কিষাণ-কিষাণীকে আঁকলেন বীর করে, রেনেসাঁস পেইন্টারেরা যেমন তাদের আঁকা চিত্রে, গড়া ভাস্কর্যে মানুষ-মানুষীকে সৌন্দর্য এবং অজেয়তার প্রতীক করে নির্মাণ করেছেন, সুলতান সেই সৌন্দর্য, সেই অজেয়তা চারিয়ে দিয়েছেন বাংলার কিষাণ-কিষাণীর শরীরে। একটি সমাজের মানুষকে তার তুলি বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের উত্থানযুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বলে বুর্জোয়ার প্রতিভূ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য উল্লসিত আবেগে শিহরিত চমকিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি কি বীররসে শেষপর্যন্ত স্থিত থাকতে পেরেছেন? তাকে কি করুণরসের অগাধ সলিলে, অবগাহন করতে হয়নি? সুলতানও কি সবটুকু বীরত্বের প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন? তাই যদি হয়, তাহলে নায়কেরা নিজ হস্তে নিজের মস্তক কেন ছেদন করে? কেন তারা নিজের হাত-পা নিজে ভেঙে বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ করে? তা হোক, তবু মধুসূদন একজন, তেমনি সুলতান আরেকজন। সময়, পরিবেশ, সমাজ, সামাজিক আদর্শ সব আলাদা। তবু তাদের কোনো পূর্বসূরি নেই, নেই কোনো উত্তরসূরি। আচমকা জলতল থেকে সুবর্ণ স্তম্ভের মতো উত্থিত হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে রয়েছেন।

বাঙালি মুসলমানের মন

'শহীদে কারবালা' পুঁথিতে কবি কারবালার যুদ্ধে শহীদ হজরতের দৌহিত্র হজরত হোসেনের মস্তকসহ ঘাতক সীমারের দামেস্ক যাত্রা অংশটি রচনা করতে গিয়ে তার কল্পনাশক্তির অবাধ ব্যবহার করেছেন। কবি বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন কারবালা থেকে দামেস্ক যাচ্ছে সীমার, মনে অপার আনন্দ, এখন হজরত হোসেন বিগতজীবন, কাঁধের বর্শার অগ্রভাগে শোভা পাচ্ছে তার কর্তিত মস্তক। লক্ষ টাকা পারিতোষিক লাভ করার পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধক অন্তর্হিত। নিশ্চয়ই বাদশাহ্ নামদার এজিদ তার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। যেতে যেতে সন্ধ্যে হলো পথে। সে রাতের জন্যে সীমারকে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। গৃহকর্তার নাম পুঁথিলেখকের জবানীতে আজর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী,তার উপর আবার ব্রাহ্মণ। সেই রাতে হজরত হোসেনের ছিন্ন মস্তক এক অলৌকিক কাজ করে ফেলল। গৃহকর্তা আজর, তার ব্রাহ্মণী, সাতপুত্র এবং সাত পুত্রবধূ এক সঙ্গে কাটা মস্তকের মুখে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

পুঁথি পুরাণের জগতে এরকম অলৌকিক কাণ্ড প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। ওই জাতীয় সাহিত্যের বেশির ভাগেরই একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মের কীর্তন করা। সেজন্যে পুঁথি পুরাণের নায়কদের চরিত্রে সম্ভব অসম্ভব সব রকমের ক্ষমতা এবং গুণগ্রাম আরোপ করাটাই বিধি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক প্রোপাগান্ডা লিটারেচারের সঙ্গে পুঁথি সাহিত্যের একটি সমধর্মিতা আবিষ্কার করা খুব দুরূহ কর্ম নয়। শুধু পুঁথি সাহিত্যে কেন,

'বৌদ্ধ জাতক' থেকে শুরু করে, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'মঙ্গলকাব্য'সমূহেরও উদ্দেশ্য ছিল ঐ একই রকম। ওই জাতীয় সাহিত্যে সচরাচর যে অবাস্তব অলৌকিক কাণ্ড ঘটে থাকে, ঘেঁটে একটা তালিকা সংগ্রহ করলে ছিন্ন মস্তকের মুখে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাটা খুব আশ্চর্য ঠেকবে না। পুঁথি পুরাণের রচয়িতাদের পাল্লায় পড়ে বনের হিংস্র বাঘ, শিংঅলা হরিণ পর্যন্ত মানুষের ভাষায় কথা বলে, দুঃখে রোদন করে, কাটা মাথা তো কোন ছার। সুতরাং ধরে নেয়া ভাল পুঁথি পুরাণের জগতে জাগতিক নিয়মের পরোয়া না করে লোমহর্ষক ঘটনারাজি একের পর এক অবলীলায় ঘটে যেতে থাকবে। রোমাঞ্চকর হিন্দি ছবির দর্শকের মতো পাঠকের রুদ্ধশ্বাসে দেখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, সম্ভব অসম্ভব, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। যেমন: লাখে লাখে সৈন্য চলে কাতারে কাতার, গণিয়া দেখিল মর্দ চল্লিশ হাজার। এ জাতীয় পঙক্তি পাঠ করার পরেও বুদ্ধিমান সিরিয়াস মানুষের মনে কোনো জিজ্ঞাসা-চিহ্ন জাগে না। অর্থাৎ সকলে ধরে নিয়ে থাকেন, পুঁথি পুরাণের জগতে এ জাতীয় ঘটনা হামেশা ঘটতেই থাকবে। এ নিয়ে মনকে কষ্ট দেওয়া খামোখা পণ্ডশ্রম। কাণ্ডজ্ঞানকে ফাঁকি দেয় এ জাতীয় এন্তার ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হতে হবে, সে ব্যাপারে আগাগোড়া প্রস্তুতি গ্রহণ করেই পুঁথি পুরাণের জগতে প্রবেশ করা উত্তম।

এরকম অভিজ্ঞতা বোধ করি অনেকেরই হয়ে থাকে। রাশি রাশি ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনার অতি সামান্য খণ্ডাংশ মুহূর্তেই ধাক্কা দিয়ে পাঠককে সচকিত করে তোলে। 'শহীদে কারবালার' বর্ণিত এই ঘটনাটিও সেই জাতীয় একটি। সীমার কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে আজর নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণের দেখা পেয়েছিল এবং তার

বাড়িতে রাতের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। এই অংশটি পাঠ করার পরে মনের ভেতরে একটি ঘোরতর অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সাধারণ একান্ত বাস্তব ঘটনাটিকে পাঠকের মনের জারক রস হজম করে নিতে পারে না। মনের তলাতে শিলাখণ্ডের মতো তা পড়ে থাকে। তিনি যদি তার বদলে ইরানী, তুরানী, ইহুদী, খ্রিস্টান, তাতার, তুর্কী ইত্যাদি যে-কোনো ধর্মের মানুষের সঙ্গে সীমারের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতেন, তাহলে পাঠকের মনে কোনো প্রশ্নই জাগত না । কিন্তু তিনি কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে ধু-ধু মরুপ্রান্তরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণকে আমদানি করলেন কোত্থেকে? একজন ব্রাহ্মণ কারবালা দামেস্কের মাঝ পথে দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাটা মস্তকের কাছে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বসবাস করছিল, এইখানে মন ভয়ংকর রকম বেঁকে বসে। শুধু 'শহীদে কারবালা' নয় 'জঙ্গনামা' পুঁথিটার উপর দৃষ্টি বুলালেও এই রকম অজস্র ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'জঙ্গনামা'তে পুঁথিলেখক হজরত আলীকে দিয়ে কাফের ও বেদীনদের উপর এমন চোটপাট চালিয়েছেন যে গদার আঘাতে থেতলানো, তলোয়ারের ঘায়ে কাটা পড়া কিংবা শেষ পর্যন্ত পবিত্র ধর্ম ইসলামের শরণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত কারো রক্ষা নেই। আমীর হামজার শৌর্যবীর্য অবলম্বন করে পুঁথি রচিত হয়েছে, পড়লে লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অনেক চমৎকার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রায়শ দেখানো হয়েছে, মহাবীর হামজা এমন শক্তিশালী যে তিনি দেশ-দেশান্তর ঘুরে ঘুরে কাফেরদের সদলবলে পরাস্ত করছেন আর তাদের ঘরের সুন্দরী নারীদের পাণিপীড়ন করে চলেছেন তো চলেছেনই। কাফের এবং হিন্দু পুঁথিলেখকের কাছে অনেকটা সমার্থক। অনেক সময় কাফের বলতে হিন্দু এবং হিন্দু বলতে কাফের ধরে নিয়েছেন। সে যা হোক, আমীর হামজা এমন মস্তবড় বীর যে তিনি দৈত্যের দেশ কো-

কাফে গমন করে অপার শৌর্য বলে দৈত্যদের দমন করে বীর বিক্রমে ফিরে এসেছেন। হজরত আলীর কল্পিত পুত্র মুহম্মদ হানিফার বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করে সোনাভান, জৈগুণবিবি ইত্যাদি যে পুঁথি লেখা হয়েছে বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সেগুলো আরো মজার। সে সকল পুঁথিতে দেখা যায় যে, মুহম্মদ হানিফা 'দুলদুল' ঘোড়ায় চড়ে দুইধারী তলোয়ার ঘুরিয়ে দেশ থেকে দেশে নব অশ্বমেধযজ্ঞ করে বেড়াচ্ছেন। পথে যেসব রাজ্য পড়ছে সবগুলো নারীশাসিত। এই নারীদের সকলেই সুন্দরী; সৎ ব্রাহ্মণ কন্যা। অবিবাহিতা এবং প্রচণ্ড রকমের বীরাঙ্গনা। আর সকলের এমন এক ধনুকভাঙা পণ যে, বাহুবলে যে পুরুষ হারাতে পারবে তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বিয়ে বসতে মোটেই রাজি নন। মুহম্মদ হানিফা সংবাদ শুনে হাওয়ার বেগে সে দেশে দেখা দিচ্ছেন, রণংদেহি হুংকার তুলছেন। বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণ কন্যাদের বাহুবলে পরাস্ত করে ইসলাম ধর্ম কবুল করিয়ে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছেন। ব্যাপারটি এতই পৌনঃপুনিকভাবে ঘটেছে যে মুহম্মদ হানিফাকেও মনে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কুলীন হিন্দু-সন্তান, বিয়ে করে বেড়ানোই তার একমাত্র পেশা। মুহম্মদ হানিফা মস্ত বীর হলে কি হবে, অধিকসংখ্যক রূপসী স্ত্রীর সঙ্গে রতি-রণ এবং ময়দান-রণ দুই-ই একসঙ্গে করতে হলে মাঝে মাঝে এই সমস্ত ভয়ংকরী বীরাঙ্গনাদের হাতেও নাকাল হতে হয়। সেকালে বীরাঙ্গনা পরাজিত করতে পারলে স্বামী আর পরাজিত হলে থাকতে হতো দাস হয়ে। সুতরাং মুহম্মদ হানিফারও দুর্দশার অন্ত থাকে না। সংবাদ যায় হজরত আলীর কাছে। বীর পুত্রের এসব কীর্তিকলাপ তিনি বিলক্ষণ সমর্থন করেন আর হৃদয়ে অপত্যস্নেহও প্রচুর। হায়দরী হক হেঁকে রণ দামামা বাজিয়ে পুত্রের সাহায্যার্থে ছুটে আসেন। পুত্রকে শিখিয়ে পড়িয়ে একেবারে লায়েক করে সেই সমস্ত বিক্রমশীলা রমণীদের হার মানতে বাধ্য করান।

তারপরে যুদ্ধকার্য সাঙ্গ হলে পিতা-পুত্র দুজনে একই সঙ্গে দুটো বিবাহ করেন। পিতা যান দেশে ফিরে আর পুত্রবর প্রেমতৃষ্ণায় মাতাল হয়ে মরুভূমির ডনজুয়ানের মতো নতুন রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে সফর করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীর এবং সাধু পুরুষদের নিয়ে যে সমস্ত পুঁথিপত্র লেখা হয়েছে তাতে তাদের ত্যাগ,ধর্মনিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় বিস্তর রসাত্মক ব্যাপার-স্যাপার স্থানলাভ করেছে। যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্র পুঁথিলেখকেরা তাদের বিষয়ের উপজীব্য করেছেন,তাতে করে চরিত্রের ঐতিহাসিক সত্য সম্পূর্ণভাবে খেলাপ করে নিজেদের মনের রঙে রাঙিয়ে একেবারে জবুথবু করে হাজির করেছেন। কল্পিত চরিত্র হলে তো কথাই নেই, আগাগোড়া রঙ চড়িয়ে রঙিলা না করে ছাড়েননি। তা করতে গিয়ে পুঁথিলেখকরা পরিবেশ, সমাজ এবং সামাজিক সংঘাত, মূল্যচেতনা দুই হাতেই দেদার ব্যবহার করেছেন।

যেমন ধরা যাক, কারবালা থেকে দামেসূকে যাওয়ার পথে কোনো ব্রাহ্মণের বসবাসের বিষয়টি। তা তো একরকম জানা কথাই যে কোনো ব্রাহ্মণের সেখানে নিবাস থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, পুঁথিলেখকের সেটি জানা থাকা চাই তো। কারবালা দামেসূকের মাঝপথে নয়, গোটা আরবদেশে ব্রাহ্মণ না থাকুক তাতে পুঁথিলেখকের কি আসে যায়? এই বাংলাদেশে তো ব্রাহ্মণ আছে। আর আমাদের পুঁথিলেখক ভদ্রলোকটি তো বাঙালি এবং তিনি ব্রাহ্মণ জাতটার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। সুতরাং অনায়াসে

ব্রাহ্মণকে কারবালা দামেস্কের মাঝপথে বসিয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ সপরিবারে তাকে দিয়ে কলেমা পড়িয়ে মানসিক ঘৃণার মানসিক প্রতিশোধ নেয়া যায় এবং নিয়েছেনও।

ইতিহাসে হজরত আলীকে কম বিচক্ষণ বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু তিনি মানুষ হিসেবে উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং তার চরিত্র এমন নির্মল সুন্দর ছিল যে এখনো পর্যন্ত তার গুণগ্রাম সর্বসাধারণের অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁথিলেখক তাকে শক্তিমন্ত এবং বীর দেখাতে গিয়ে পশুশক্তিতে বলীয়ান হৃদকম্পসৃষ্টিকারী একজন প্রায় নারীলোলুপ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

হজরত হামজা মদিনাতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং হিন্দা নাম্নী জনৈকা কোরেশ রমণী যে তার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খেয়েছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। তিনি জীবনে মক্কা-মদীনার বাইরে কোথাও গিয়েছেন কিনা সন্দেহ। পুঁথিলেখক তাকে শতাধিক বছর পরমায়ু দান করেছেন, কমপক্ষে অর্ধশত পত্নীর স্বামী, সে অনুপাতে পুত্র পৌত্রাদি উপহার দিয়েছেন। আমির হামজা হাজারখানেক যুদ্ধে বিজয়ী বীর, দেশ-দেশান্তরে তার তো অবারিত গতায়ত, এমন কি দৈত্যের দেশ কো-কাফে গিয়েও অসম সাহসিক কাজ সামাধা করে এসেছেন। হিন্দু সমাজের বীরেরা যদি পাতাল বিজয় করে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারেন, আমির হামজা দৈত্যের দেশে গমন করে তাদের শায়েস্তা করে আসতে পারবেন না কেন? ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে মুহম্মদ হানিফার মূল কাণ্ড কিছু নেই বলেই তো সুবিধে। কল্পনা যেভাবে ইচ্ছে বিচরণ করতে পেরেছে। হিন্দুদের দেবতা

শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে মোলশত গোপবালা নিয়ে লীলা করতে পারেন, মুহম্মদ হানিফার কি এতই দুর্বল হওয়া উচিত যে মাত্র এ কয়টা ব্রাহ্মণ কন্যাকে সামলাতে পারবেন না!

.

২.

এই ধরনের দো-ভাষী পুঁথিসমূহের বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে পড়বেই। সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি হলো: প্রথমত ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্যই এই সকল কাহিনী লেখকরা প্রবৃত্ত হয়েছেন। নায়কের অসাধারণ শৌর্যবীর্য এবং অসমসাহসী ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে সত্য ধর্মের বিজয়ই স্ফুরিত হচ্ছে,এটা স্বদেশবাসীর কাছে স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ করাই বেশির ভাগ লেখকের মনোগত অভিপ্রায়। মহাভারতের বাংলা অনুবাদক যেমন বলেছেন: মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান! তার অনুকরণ করে পুঁথিলেখকও পাঠক এবং শ্রোতাদের কাছে লোভনীয় আবেদন রেখেছেন। একটা দৃষ্টান্ত: অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত, যেবা শুনে বাড়ে তার বারেক হায়াত। এজাতীয় হৃদয় মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী আশাব্যঞ্জক পঙক্তিমালা পুঁথিগুলোর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং বিশ্বাস করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে মানুষের মনে ধর্মবোধ জাগ্রত করা এবং ইসলাম ধর্মাশ্রিতমানুষের হাতে যে সাংসারিক সম্পদ, সুন্দরী নারী আপনাআপনি এসে পড়ে এবং পরকালে অনন্ত সুখভোগের লীলাস্থল বেহেশত তো তাদের জন্য অবধারিত,

আর শত্রুদের উপর তাদের বিজয় অর্জন সে তো একরকম স্বাভাবিকই। এই সকল বিষয় প্রমাণ করাই ছিল পুঁথিলেখকদের অধিকাংশের মনের প্রাথমিক অভিপ্রায়। দ্বিতীয়ত, এই পুঁথিসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে একটা জিনিস বার বার চোখে পড়তে থাকে। যে সময়ে ওগুলো রচিত হয়েছিল, সে সময়কার মুখ্য গৌণ বিবদমান, বর্ধিষ্ণু ক্ষয়িষ্ণু যে সকল সামাজিক ধারা, ধারাসমূহের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব সংঘাত কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কোথাও সুস্পষ্টভাবে পুঁথিসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তুর্কী আক্রমণের ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চলমানতার সঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলমানতা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদ্দেশ্যেই পুঁথিলেখকেরা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তার ফলে তাদের মনেও নতুন এক ধরনের জনপ্রিয় বীরশ্রেণী জন্মলাভ করতে আরম্ভ করে। পুরনো সমাজের যে সকল নায়ক, খলনায়ক-রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, ভীম, অর্জুন, হনুমান, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, দ্রৌপদী ইত্যাদির কাহিনীতে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণে মুসলমান সমাজ মনোনিবেশ করতে রাজি ছিল না। এই নতুন সমাজের নিজস্ব নায়ক চাই, চাই নিজস্ব বীর। যাদের জীবনকথা আলোচনা করে দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে ভরসা পাওয়া যায়, যারা তাদের আপনজন হবেন এবং একটি আদর্শায়িত উন্নত জীবনের বোধ সৃষ্টি করতে পারবেন। এই সকল কারণের দরুন হজরত মুহম্মদ, হজরত আলী, বিবি ফাতেমা, হাসান-হোসেন, বীর হানিফা, আমির হামজা, হাতেমতাই, রুস্তম ইত্যাদি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নবজন্ম লাভ করে। তাদের জন্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি মুখ্য বিষয় মিলমিশ খেয়েছে। এই ঐতিহাসিক মহামানবদের যে সকল কীর্তি-কাহিনী লোকশ্রুতি জনশ্রুতি

আকারে তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে (পুঁথিলেখকদের অধিকাংশই আরবী ফার্সী ভাষা জানতেন না এবং ইসলামি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না) তার সঙ্গে মহামানব এবং সামাজিক নায়কদের সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা তৎকালীন সমাজে বলবৎ ছিল তার সংশ্লেষ ঘটেছে। তাই ইসলামের ইতিহাসের দিকপালদের নিয়ে রচিত পুঁথিসাহিত্যে যেমন চরিত্রের ঐতিহাসিকতাকে পাওয়া যাবে না, তেমনি বাঙালি সমাজের প্রচলিত বীরদের সম্বন্ধে যে ছকবাঁধা ধারণা বর্তমান ছিল তাও পুরোপুরি উঠে আসেনি। দুটি মিলে একটি তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে পুঁথিসাহিত্য হলো দুটি পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তারই প্রতিফলন। মুসলমান জনগণের মতো হিন্দু জনগণও আরেকরকমভাবে এই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়েছেন, মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে ঘটেছে তার প্রকাশ।

এই নবসৃষ্ট সাহিত্যকর্মসমূহের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে নতুন সামাজিক চাহিদার জবাব রয়েছে। জনগণ যে ধরনের রসালো কাহিনী শুনতে আগ্রহী সে ধরনের কাহিনীই লেখকরা পরিবেশন করেছেন। মুসলমান এবং হিন্দু সাহিত্যস্রষ্টারা আপনাপন সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই সৃষ্টিকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু কবিদের অনেকগুলো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত আক্রমণমুখী বর্ধিষ্ণু মুসলমান সমাজের সঙ্গে সংঘাতে হিন্দু সমাজের তলা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আত্মরক্ষার প্রয়োজনটাই ছিল তাদের কাছে বড় কথা। হিন্দু কবিরা এই সামাজিক ভীতির সঙ্গে একাত্মবোধ না করে পারেননি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যখনই কোনো নতুন

সামাজিক পরিবর্তন এবং নবতরো মূল্যচেতনা সমাজের অভ্যন্তর থেকে সূচিত হয়েছে, তার প্রাণবস্তুটি সাহিত্য-স্রষ্টাদের কণ্ঠে আপনা থেকেই কথা কয়ে উঠেছে। আর মুসলমান শাসনামলে হিন্দু সমাজের যে সামাজিক রূপান্তর ঘটছিল তাতে সংস্কৃতিগত ব্যবধান ছিল না, নিজেদের সংস্কৃতিকে নিজেদের প্রয়োজনে নতুনভাবে রূপদান করেছিলেন। যেখানে বিষয় এবং বিষয়ীর সঙ্গে কোনো দূরত্ব বা বিরোধ নেই। সমাজের পূর্বার্জিত সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহকে পূর্ণ বিশ্বাসে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মুসলমান পুঁথিলেখকদের তুলনায় হিন্দু কবিদের রচিত সাহিত্যকর্মে যে অধিক মানসিক পরিশ্রুতি, গঠনপরিপাট্য এবং কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তার কারণ তাদের সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয়ের প্রতি ধাবিত হতে হয়নি।

তুলনামূলক বিচারে মুসলমান পুঁথিলেখকদের হাতে সে পরিমাণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধে ছিল না। প্রথমত তাদেরকে সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয়কে প্রকাশ করতে হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আসল স্বরূপ, তার দার্শনিক প্রতীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে মুসলমানদের আরবী ফার্সীতে লেখা গ্রন্থসমূহের বদলে লোকশ্রুতি এবং দূরকল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। একথাও সত্য যে, পুঁথিলেখকদের অধিকাংশেরই আরবী ফার্সী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। তাছাড়া হিন্দুদের দেব-দেবী এবং কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকাদের প্রতি মনে মনে একটি বিদ্বেষের দূরস্মৃতিও সক্রিয় ছিল। কেননা এই দেবদেবীর পূজারীদের অত্যাচার এবং ঘৃণা থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমান পুঁথিলেখকেরা তাদের রচনায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন, এই দেবদেবীর

প্রতি তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের দেবদেবী, নায়ক-নায়িকার প্রভাব থেকে তাদের মন মুক্ত হতে পারেনি। তাই তারা সচেতনভাবে এই দেবদেবীদের প্রতিস্পর্ধী নায়ক এবং চরিত্র যখন খাড়া করেছেন, এই সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্যেই দেবদেবী নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। হজরত মুহম্মদ, হজরত আলী, আমীর হামজা, মুহম্মদ হানিফা, বিবি ফাতেমা, জৈগুন বিবি এই চরিত্রসমূহ বিশ্বাসে এবং আচরণে, স্বভাবে চরিত্রে যতদূর আরবদেশীয়, তার চাইতে বেশি এদেশীয়। তাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়াবেগ কাব্যলেখক চাপিয়ে দিয়েছেন তা একান্তভাবেই বঙ্গদেশে প্রচলিত দেবদেবীর অনুরূপ। বাইরের দিক থেকে দেখলে হয়তো অতটা মনে হবে না। কিন্তু গভীরে দৃষ্টিক্ষেপ করলে তা ধরা না পড়ে যায় না। বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা সাহিত্যের দুই মুখ্য উপাদান। বিশ্বাস অভিজ্ঞতার নব রূপায়নে সাহায্য করে। আলোকিত বিশ্বাস আলোকিত রূপায়ণ ঘটায় এবং অন্ধবিশ্বাস অন্ধ রূপায়ণ। মুসলমান পুঁথিলেখকদের বিশ্বাসের যে শক্তি তা অনেকটা অন্ধবিশ্বাস, কেননা ইসলামি জীবনবোধসমৃদ্ধ বিমূর্ত কোনো ধারণা তাদের ছিল না। তাই তাদের শিল্পকর্ম অতটা অকেলাসিত। প্রতি পদে কল্পনা হোঁচট খেয়েছে বলে তাদের রচনার শক্তি নেই। আলাওল, দৌলত উজির প্রমুখ মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করতে পেরেছেন। তার কারণ তাদের কতিপয় সুযোগ ছিল। আলাওল নিজে আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যের স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে তার পরিপূর্ণ বোধ ছিল। তদুপরি তিনি রাজসভায় বসে কাব্য রচনা করেছিলেন। রাজসভায় যে-রুচি এবং জীবনাদর্শের আলোচনা চলতে পারে,জনসভাতে তা চলে না। একই কথা দৌলত উজির সম্বন্ধেও কম-বেশি প্রযোজ্য।

কিন্তু যে সকল মুসলমান কবিকে জনগণের ধর্মবোধ পরিতৃপ্তি এবং রসপিপাসা মিটাবার জন্য কলম ধরতে হয়েছিল, সেখানে কবি কি বলতে চান, কাদের জন্য বলতে চান এবং যা বলছেন তা অনুধাবনযোগ্য হচ্ছে কিনা এইসব বিবেচনার বিষয় ছিল।

.

৩.

মুসলমান সমাজের কোন অংশের সামাজিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এই পুঁথিসমূহ লেখা হয়েছিল, এবং কারা লিখেছিলেন। তাদের বিদ্যাবত্তা এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কতদূর ছিল- তলিয়ে বিচার করলে কতিপয় বিষয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। মূলত বাঙালি সমাজের যে শ্রেণীটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করার কারণে, অধিকতরো খোলাসা করে বলতে গেলে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন, তাদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই শ্রেণীটিতেই ছিল পুঁথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তারাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার। তাছাড়া রোসাঙ ইত্যাদি রাজদরবারে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের যে চর্চা হয়েছে, তাতে যে সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিক আশাতিরিক্ত সাফল্য প্রদর্শন করেছেন জনগণের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে তার সংযোগ খুব নিবিড় কিংবা গভীর ছিল না। রাজসভার বিদ্যাবত্তা, মার্জিত রুচি বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ধরনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাওল প্রমুখ শক্তিমন্ত কবির কাব্য-

ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আর কবিরাও ছিলেন বহুদর্শী পণ্ডিত। আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষাতে ছিলেন সমান পারদর্শী। তাদের সাধনার মধ্যে কাব্যের ঔচিত্যবোধ জখম হয়নি বটে, কিন্তু জনগণের জীবনধারার সমতলে এসে চাহিদামতো কাব্যরচনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জনগণের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কহীন জ্যোৎস্নাভুক সৌন্দর্যবিলাসী ছিলেন বলেই তাদেরকে কাব্যের সামাজিক আদর্শ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। আরবী ফার্সী থেকে যে কোনো কাহিনী অনুবাদ করে রসসমৃদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত এবং তাদের সে যোগ্যতায় ঘাটতি ছিল না।

দো-ভাষী পুঁথিলেখকদের সমস্যা ছিল ভিন্নরকম। তারা ছিলেন একই সঙ্গে জনগণের শিল্পী এবং শিক্ষক। পুঁথিসমূহের অনেকগুলোর রচনার পেছনে সক্রিয় ছিল সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূর্ণভাবে পালন করার জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। যে সামাজিক আদর্শটি তারা প্রচার করছিলেন, সেই বিশেষ সমাজটির লোক-সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনার মান; বিমূর্তভাবে নতুন সামাজিক আদর্শ ধারণ করার মতো মানসিক সাবালকত্ব অর্জন করেছে কিনা সে সম্বন্ধে একটা প্রাক ধারণা এবং পূর্বের শিল্পাদর্শের অগ্রসর ধারাটির বিষয়ে তাদের উপযুক্ত জ্ঞান আর সেই ধারাটিকে সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ নতুন একটি খাতে প্রবাহিত করার ক্ষমতা ছিল কিনা। এই তিনটি মৌল বিষয়ের কোনোটিই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুঁথি লেখকদের সপক্ষে ছিল না। সামাজিক বীর এবং নায়ক সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মহিমা কীর্তন করার উদ্দেশ্যেই তাদের বেশির ভাগ কাব্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু

ইসলাম সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান কিছু লোকশ্রুতি,জনশ্রুতি, আউলিয়া দরবেশদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত ছিল। আরবী ফার্সী ভাষায় দখলের অভাবে অধিকাংশেরই মনে ইসলাম বলতে একটা পাঁচমেশালী ঝাঁপসা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের রচিত সাহিত্যে সেই ধারণারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাছাড়া যে সমাজের লোকসাধারণের কাছে নতুন ধর্মের সারল্য এবং সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করছিলেন, সেই সমাজটির মানসিক পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সংকুচিত ছিল। কেননা নিম্নবর্ণের অধিকাংশ হিন্দুই যুগ যুগ ধরে আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিপীড়িত হওয়ার ফলে মুক্তির আশায় প্রথমে বৌদ্ধ এবং পরে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। নতুন ধর্ম গ্রহণ ছিল একটি নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ। সুতরাং পূর্ববর্তী সমাজেও যে গরীয়ান একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, তারা তার মর্মমধু পান করা থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আবার ইসলামি সমাজ এবং সংস্কৃতির যে একটা উন্নত উদার আদর্শ ছিল ঐতিহাসিক কারণে তাও তারা অধিগত করতে পারেননি। এই অনগ্রসর জনসমাজ ইসলামের নামে যে সকল কাহিনী চাইতেন, সেই রকম কাহিনীই তাদের শোনাতে হতো। আর পুঁথিলেখকরা ছিলেন এই জনগণেরই কণ্ঠ।

এই সকল কারণে বাঙালি মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যে উদ্ভট রসের অতি বেশি ছড়াছড়ি। হিন্দু মহাকাব্য এবং পুরাণসমূহের বীর-বীরাঙ্গনাদের চরিত্রের অপভ্রংশ মুসলিম কবিদের সৃষ্ট বীরদের মধ্যে নতুন করে জীবনলাভ করেছে। তাই পুঁথিসাহিত্যে অগ্রসরমানতার চাইতে প্রতিক্রিয়ার জের অধিক। মনের হীনম্মন্যতাবোধ থেকেই এই

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। এর পেছনে একগুচ্ছ ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। মুসলমান পুঁথিলেখকেরা সচেতনভাবে এক সামাজিক আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটি সামাজিক আদর্শ, একটি শিল্পাদর্শের বদলে আরেকটি শিল্পাদর্শ নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন শিল্পাদর্শটির চেহারা কি রকম হবে, জীবনের কোন্ মূল্যচেতনার বাহন হবে, অতীতে কতদূর গ্রহণ করবে, কতদূর বর্জন করবে, সে সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না। তাই তারা অনেক সময় বহিরঙ্গের দিক দিয়ে নতুন সৃষ্টি করলেও, আসলে তা ছিল গলিত অতীতেরই রকমফের। উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, পরিচ্ছন্ন চিন্তার বদলে ভাবাবেগই তাদের শিল্পদৃষ্টিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে। একসময় এই মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা যে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, এই অপমানজনক দূরস্মৃতি বাইবেলের 'অরিজিন্যাল সিন' বা আদি পাপের ধারণার মতো তাদের মনে নিরন্তর জাগরুক থেকেছে। মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতারই সাহিত্যিক রূপায়ণ। সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে হলে এই অপমানজনক দূরস্মৃতির বিষয়টি স্মরণে রাখার প্রয়োজন আছে। মুসলিম শাসনের অবসানের পর এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া আরো গভীর এবং অন্তর্মুখী রূপ পরিগ্রহণ করে। এই প্রতিক্রিয়ার জের বাঙালি মুসলমান সমাজে এত সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী গদ্য লেখক মীর মশাররফ হোসেনের সুবিখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটিতেও 'শহীদে কারবালা পুঁথির ব্রাহ্মণ আজরকে একই চেহারায়, একই পোশাকে,একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সময়ের পালাবদলের ব্যাপারটি এই অত্যন্ত শক্তিধর লেখকের মনে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারেনি। পুঁথিলেখকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে তিনিও বরণ করে নিয়েছেন।

.

৪.

যেহেতু নবদীক্ষিত মুসলমানদের বেশির ভাগই ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু, তাই আর্য সংস্কৃতিরও যে একটা বিশ্বদৃষ্টি এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে একটা প্রসারিত বোধ ছিল, বর্ণাশ্রম ধর্মের কড়াকড়ির দরুন ইসলাম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে সে সম্বন্ধেও তাদের মনে কোনো ধারণা জন্মাতে পারেনি। পাশাপাশি ইসলামও যে একটা উন্নত দীপ্ত ধারার সভ্যতা এবং মহীয়ান সংস্কৃতির বাহন হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে একটা সামাজিক বিপ্লব সংসাধন করেছিল, বাঙালি মুসলমানের মনে তার কোনো গভীরাশ্রয়ী প্রভাবও পড়েনি বললেও চলে। প্রথমত, ভারতে ইসলাম প্রচারে মধ্যপ্রাচ্যের সুফি দরবেশদের একটা গৌণ ভূমিকা ছিল বটে, কিন্তু লোদী, খিলজী এবং চেঙ্গিস খানের বংশধরদের সাম্রাজ্য বিস্তারই ইসলাম ধর্মের প্রসারের যে মুখ্য কারণ, তাতে কোনো সংশয় নেই । এই পাঠান মোগলদের ইসলাম এবং আরবদের ইসলাম ঠিক এক বস্তু ছিল না। অব্বোসীয় খলিফাঁদের আমলে বাগদাদে, ফাতেমীয় খলিফাঁদের আমলে উত্তর আফ্রিকায় এবং উমাইয়া খলিফাঁদের স্পেনে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল, ভারতবর্ষে তা কোনোদিন প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। মুসলমান বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের যে অপ্রতিহত প্রভাব ইউরোপীয় রেনেসাঁকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল, ভারতের মাটিতে সে যুক্তিবাদী জ্ঞানচর্চা একেবারেই শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়া, সঙ্গীত

কলা, স্থাপত্যশিল্প, উদ্যান রচনা এবং ইরান, তুর্কীস্থান ইত্যাদি দেশের শাসনপদ্ধতি এবং দরবারী আদব-কায়দা ছাড়া অন্য কিছু ভারতবর্ষ গ্রহণ করেনি।

তদুপরি, এই ভারতবর্ষের লক্ষৌ, দিল্লি ইত্যাদি অঞ্চলে ইসলামের যেটুকু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে বাংলা মুলুকে তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছোতে পারেনি। যে মুসলিম শাসক শ্রেণীটি নানা সময়ে বাংলাদেশ শাসন করতেন, তারা সকলেই ছিলেন বিদেশী। রক্ত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনেকটা ইউরোপীয় শাসকদের মতো সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তারা বসবাস করতেন এবং নতুন পোশাক-আশাক ফ্যাসান ইত্যাদির জন্যে দিল্লি কিংবা ইরানের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকতেন। এই উঁচুকোটির মুসলিম শাসকবর্গ যাদের হাতে অধিকাংশ শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তারা স্থানীয় জনগণের স্বাভাবিক নেতা ছিলেন না। এই উঁচুকোটির মুসলমান প্রশাসকেরা এদেশীয় যে শ্রেণীটির সহায়তায় বাংলাদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন,তারা প্রায় সকলেই ছিলেন স্থানীয় উঁচু বর্ণের বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কিংবা বৈদ্য শ্রেণীর লোক। যখনই প্রয়োজন পড়েছে কিংবা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আনুগত্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জেগেছে তারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর থেকে খেলাত এবং পদবী বিতরণ করে আরেকটি নেতৃশ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। 'খাসনবীস,' 'মহলানবীস', দেওয়ান', 'রায়রায়ান', 'বখসী', 'মুন্সী', 'দস্তিদার' ইত্যাদি পদবীতেই তার প্রমাণ মেলে। বাংলার স্থানীয় মুসলমানেরা কদাচিত বিদেশী মুসলমান শাসকদের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মে সহায়তা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তার কারণ ছিল, একটি রাজশক্তির সঙ্গে সহায়তা করার জন্য যে পরিমাণ নিরাপদ আর্থিক ভিত্তির প্রয়োজন বাঙালি মুসলমানদের

তা ছিল না। মুসলিম রাজশক্তি এই দেশের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে অতি সামান্যই রূপান্তর এনেছিলেন। তারা অনেকটা নির্বিবাদেই পূর্বতন সমাজ কাঠামোকে গ্রহণ করেছিলেন। পরিবর্তন ততটুকুই করেছিলেন, যতটুকু তাদের প্রয়োজন। অর্থাৎ পূর্বেকার শাসক নেতৃশ্রেণীর শূন্যস্থানটি তারা পূর্ণ করেছিলেন । মুসলিম শাসনের পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থাটি চালু ছিল, পরেও সেই একই ব্যবস্থা চালু থেকেছে। তার মধ্যে কোনো মৌলিক রূপান্তর বা পরিবর্তন তারা আনতে পারেননি। তাই নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পরেও স্থানীয় মুসলমানেরা ইংরেজ আমলের দেশী খ্রিস্টানদের মতো একটা উন্মত্ত গর্ববোধ ছাড়া ইসলামি কিংবা আর্য সংস্কৃতির কিছুই লাভ করতে পারেনি। তাই খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মুসলমান আমলেও যারা প্রশাসনিক প্রয়োজনে গার্সী ভাষা শিক্ষা করেছেন, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের উঁচু বর্ণের লোক। বাঙালি মুসলমানদের অবস্থার, পেশার এবং রুচির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা কতিপয় মোটা অভ্যেস বর্জন করে কতিপয় মোটা অভ্যেসকে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সংখ্যাগত দিক দিয়ে তারা ছিলেন অনেক,উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন এবং রাজশক্তি সময়ে অসময়ে তাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন, এই সকল কারণের দরুন তাদের মধ্যে দ্রুত একটা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করেছিল। পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ দৈর্ঘ্যে মুক্তিলাভ করেছে।

.

৫.

এই পুঁথিসমূহের দো-ভাষী অর্থাৎ বাংলা এবং আরবী-ফার্সী মিশ্রিত হওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত দূরবর্তী ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান । হাদিসে তিনটি কারণে অন্যান্য ভাষার চাইতে আরবীকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম হলো, কোরআনের ভাষা আরবী। দ্বিতীয় কারণ, বেহেশতের অধিবাসীদের ভাষা আরবী এবং তৃতীয়ত, হজরত মুহম্মদ নিজে একজন আরবীভাষী ছিলেন। এই তিনটি মুখ্য কারণে যে সমস্ত দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, সেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে এই ভাষাটিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আরব অধিকারের পূর্বে মিশর এবং আফ্রিকার দেশসমূহের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা দুই-ই ছিল। কিন্তু আরবদের অধিকারে আসার পর আরবী ভাষা এবং ইসলাম অনেকটা অভিন্নার্থক ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ না করে ইসলাম গ্রহণ করলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে না, সে সময়ে এ রকম একটা প্রবল মত অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। অন্য যে-কোনো সেমিটিক ধর্মের মতো ইসলামেও পারলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সারা জীবন মুসলমান হিসেবে জীবন কাটিয়ে পরকালে বেহেশতে গিয়েও ভাষাজ্ঞানের অভাবে একঘেয়ে জীবন কাটাতে হবে এটা ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেরই সহ্যের অতীত একটা ব্যাপার। তাই মিশর থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা আরবী ভাষা এবং বর্ণমালা দুটিই গ্রহণ করেছিলেন।

মিশরে যেভাবে সহজে আরবী ভাষা জনগণের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে, ইরানে তেমনটি হতে পারেনি। কারণ ইরানীরা ছিলেন অতিমাত্রায় ঐতিহ্য-সচেতন এবং সংস্কৃতিগতপ্রাণ জাতি। তাদের মহীয়ান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে এ যুক্তি উদ্ধার করতে

বিশেষ বেগ পেতে হয়নি যে আরবী ভাষা না আয়ত্ত করেও প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায়। কোরানের প্রকৃত শিক্ষা তাদের নিজস্ব ভাষায় বিকশিত করে তোলার মতো ভাষাগত সমৃদ্ধি এবং মনীষা দুই-ই তাদের ছিল । আরবী ভাষাকে গ্রহণ বর্জন প্রশ্নে ইরানী সমাজ যে একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল,কবি শেখ সাদী, দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ তা গ্রহণ করেছিলেন । ইরানীরা আরবী ভাষা গ্রহণ করেননি, কিন্তু আরবী বর্ণমালা তাদেরকে মেনে নিতে হয়েছে। তারপরে ইরান থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পেরিয়ে ভারতবর্ষ অবধি মুসলিম শক্তির যে জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে তার পেছন পেছন ফার্সী ভাষাও ভারতে প্রবেশ করেছে। এমনকি মোগল বিজেতারাও তাদের মাতৃভাষা তুর্কীর পরিবর্তে ফার্সীকেই সরকারি ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। মিশরে আরবী যেমন, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে ফার্সী যেমন চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষে সেভাবে অনেক দিন রাজভাষা থাকার পরও ফার্সীকে চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের হিন্দুরা বড় আশ্চর্য জাত, তারা দরবারে চাকরি করার জন্য উত্তম রূপে ফার্সীভাষা শিক্ষা করেছেন, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো' উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে কখনো ঐ ভাষাটিকে গ্রহণ করেননি। সুতরাং ভারতে ফার্সী ছিল জনগণের দৈনন্দিনতার স্পর্শলেশবর্জিত দরবারবিহীন একটি অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। স্থানীয় মুসলিম জনগণের মধ্যেও তার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। স্বাতন্ত্রগর্বী মুসলমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফার্সী বর্ণমালাকে গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষা সমূহের সমন্বয়ে উর্দু নামে একটি পাঁচমিশালী ভাষা তৈরি করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন রেনেসাঁর যুগে জাতীয় ভাষাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূর্বে ল্যাটিন ভাষাতে সন্দর্ভ ইত্যাদি রচনা করতেন, তেমনি মুসলিম ধর্মবেত্তারা ধর্মগ্রন্থসমূহের টীকাটিপ্পনী ফার্সী ভাষাতেই রচনা করতেন। সৈয়দ আহমদের আলীগড়

আন্দোলনের পর উর্দু ভাষাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ ভাষাতেই ধর্মীয় সন্দর্ভসমূহ লেখা হতে থাকে।

বাঙালি মুসলমানের চোখে ফার্সী এবং উর্দু ভাষা দুটো আরবীর মতোই পবিত্র ছিল। আর এ দুটো রাজভাষা এবং শাসক নেতৃশ্রেণীর ভাষা হওয়ায়, তাদের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিকেও পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার জন্য একটি সমাজের পেছনে যে শক্ত আর্থিক ভিত্তি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন ছিল দুটির কোনোটিই তাদের ছিল না। কলকাতার পার্কস্ট্রিট এলাকার অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা যে ধরনের ইংরেজি বলেন কিংবা ঢাকার কুটি অধিবাসীরা যে উর্দু বলেন ততটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করাও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজ এবং ইংরেজি ভাষা আর ঢাকার কুট্টিদের সঙ্গে উর্দু এবং নবাবদের সামাজিক মেলামেশার যে সুযোগ ছিল, বাংলার আম জনগণের সঙ্গে উর্দু-ফার্সী জানা শাসক নেতৃশ্রেণীর ততটুকুও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাঙালি মুসলমানেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আরবী ফার্সী এবং উর্দু ভাষাটাও যখন তাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করা অসম্ভব মনে হয়েছে তখন ঐ বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়ার আছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ একটা ভাষা রপ্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটাকে সামাজিকভাবে রপ্ত করা বলা চলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও আরবী হরফে বাংলা পুঁথিপত্র যে লেখা হয়েছে সেটাকে কজন অবসরভোগী পুঁথিলেখকের নিছক খেয়াল মনে করলে ভুল

করা হবে। আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবী হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলাভাষার সঙ্গে এন্তার আরবী ফার্সী শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এরা ছিলেন সেই জনগণ সংস্কৃত ভাষা যাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবী অজানা, ফার্সীর নাম শুনেছেন এবং উর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।

সুযোগ পেলে তারা আরবীতে লিখতেন, নইলে ফার্সীতে, নিদেনপক্ষে উর্দুতে। কিন্তু যখন দেখা গেল এর একটাও সামাজিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তখন বাধ্য হয়েই বাংলা লিখতে এসেছেন। কেউ কেউ সন্দ্বীপের আবদুল হাকিমের সেই 'যেজন বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী। সেজন কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি' পঙক্তিগুলো আউড়ে বলে থাকেন যে নিজেদের ভাষার প্রতি পুঁথিলেখকদের অপরিসীম দরদ ছিল। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিশ্চয়ই সে সময়ে এমন লোক ছিলেন যারা সত্যি সত্যি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতেন। আবদুল হাকিম নিজে সে শ্রেণীভুক্ত নন, তাই সে উঁচু ভাষাতে তার অধিকারও নেই। তাই তিনি তার একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম ভাষাতেই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন ।

দূর অতীতের কথা বলে লাভ নেই। ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফও মুসলমান সমাজের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উর্দু ভাষার সুপারিশ করেছিলেন। জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক যিনি ছিলেন বাংলার প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, তিনিও

বাড়িতে উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। ঢাকার কুট্টি অধিবাসীদের অনেকেই অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, তা হলো বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশেরই মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগ অনেক দিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।

.

৬.

পলাশীর যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনুসৃত নীতির ফলে যে উঁচু কোটির মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণীটি ছিল তার অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। ভাষাগত দিক দিয়ে তারা বাঙালি মুসলমান জনগণের সঙ্গে কোনোরকমে সম্পর্কিত ছিলেন না। এদেশে অনেকটা বিদেশীর মতোই অবস্থান করতেন। সরকারি চাকরিই ছিল তাদের এ দেশে অবস্থান করার মুখ্য অবলম্বন। নবাবী আমলের অবসানের পর যখন ইংরেজ শাসন কায়েম হলো, তারা না পারলেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, না পারলেন নিজেদের ধর্মীয় জনগণের নেতৃত্বদান করতে। রক্তগত, ভাষাগত, রুচি, সংস্কৃতি এবং আচরণগত ব্যবধানের দরুন আপদকালে সমাজে নেতৃশ্রেণীর পালনীয় যে ভূমিকা রয়েছে, বাংলাদেশে অবস্থানকারী অভিজাত মুসলিম। শ্রেণীটির তা পালন করার কথা একবারও মনে আসেনি।

কিন্তু উত্তর ভারতে হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণীটি মোগল শাসনের আমলে সবদিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। অত্যল্পকাল গত না হতেই স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তারা নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য মনন এবং মানসিকতার পরিবর্তনে লেগে যান। তার ফল আলীগড় কলেজ। এই কলেজের সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য যে অবদান তাহলো মুসলিম নেতৃশ্রেণীকে পুঞ্জীভূত হতাশা থেকে উদ্ধার করে ব্রিটিশমুখী করা এবং ব্রিটিশ শাসকদেরও সিপাহী যুদ্ধের সংশয় সন্দেহের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে মুসলিমমুখী করে তোলার ব্যাপারে, ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ নিজে, তার বন্ধু এবং অনুরাগীবর্গ ও প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাই সেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া, ব্যবসাবাণিজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাইতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিলেন। আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার পদ্ধতিটা ভালভাবে শিখিয়েছিলেন। তার চিন্তা সারা ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি শেকড় বিস্তার করেছিল যে আলীগড়শিক্ষিত মুসলমানেরা কদাচিৎ সুযোগসন্ধানী নীতি পরিহার করতে পেরেছিলেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদকে এজন্য আলীগড়ে শিক্ষিত মুসলমানদের মানসিকতার পরিবর্তন আনার জন্যে প্রায় জেহাদ করতে হয়েছে। তথাপি তিনি সফল হয়েছেন। একথা বলা চলে না- যাক, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। উত্তর ভারতে শাসক নেতৃশ্রেণী একটা সামাজিক নেতৃত্ব নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, কেননা জনগণ এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি ও আচারগত শ্রেণীদূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো দূরত্ব ছিল

না। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণী একেবারে তলিয়ে গেল। কিন্তু তাদের আচার আচরণ সামাজিক আদর্শ অটুট থেকে গেল। হিন্দু সমাজের প্রতিযোগিতা এড়িয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কপাকণা সম্বল করে যে সকল মুসলমান উপরের দিকে উঠে আসতেন, মৃত মুসলিম অভিজাতদের আদর্শকেই তাদের নিজেদের আদর্শ বলে বরণ করে নিতেন। এরা আবার অনেক সময় আপন মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ যা করেছেন বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য একই কাজ করা উচিত মনে করতেন।

প্রায়শ হালের একগুঁয়ে ইতিহাস ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারা বলে থাকেন, ব্রিটিশ শাসনের আমলে বাংলার মুসলমান সমাজ অধঃপতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এটা পুরো সত্য তো নয়ই, সিকি পরিমাণ সত্যও এর মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, মুসলিম শাসনের অবসানের পর শাসক নেতৃশ্রেণীটির দুর্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালি মুসলমান জনগণের একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো যোগসূত্র ছিল কি? আর মুসলমান জনগণের অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিক ভাল ছিল কি? নবাবী আমলেও এ দেশীয় ফার্সী জানা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হতো, তাদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কতজন ছিলেন এবং কতজন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, এ সকল বিষয় বিচার করে দেখেন না বলেই অতি সহজে অপবাদের বোঝাটি ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা দায়িত্বমুক্ত মনে করেন।

উত্তর ভারতেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণী এইভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অধিকন্তু তাদের অনেকেই সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার পরেও তারা কি করে এগিয়ে আসতে পারলেন এবং তাদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হলো স্যার সৈয়দ আহমদের মতো একজন মানুষ। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে তেমন একজন মানুষ জন্মালেন না কেন? এই সকল বিষয়ে সদুত্তর সন্ধান করলেই বাঙালি মুসলমানের যে মৌলিক সমস্যা তার মূলে যাওয়া যাবে ।

বাঙালি মুসলমান কারা? এক কথায় এর উত্তর বোধকরি এভাবে দেয়া যায়: যারা বাঙালি এবং একই সঙ্গে মুসলমান তারাই বাঙালি মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাংলাদেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন যারা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালি ছিলেন না। আর্থিক,সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধাগুলো তাদের হাতে ছিল না বলেই বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে কৃষ্টি সংস্কৃতিগত ভেদরেখাসমূহ অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই প্রভুত্বশীল অংশের রুচি, জীবনদৃষ্টি, মনন এবং চিন্তন পদ্ধতি অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । বাঙালি মুসলমানের যে ক্ষুদ্র অংশ কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে যখন সামাজিক প্রভুত্ব এবং প্রতাপের অধিকারী হতেন, তখনই বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চুকে যেত এবং উঁচু শ্রেণীর অভ্যাস, রুচি, জীবনদৃষ্টির এমনকি ভ্রমাত্মক প্রবণতাসমূহও কর্ষণে ঘর্ষণে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন।

মূলত বাঙালি মুসলমানেরা ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হলো, এদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তারা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাদের কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার মৃত্তিকার সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল। যেমন কল্পনা করা হয়, অত সহজে এই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হতে পারেনি। বাংলার আদিম কৌম সমাজের মানুষেরা সর্বপ্রকারে যে ওই বিদেশী উন্নত শক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন- ছড়াতে, খেলার বোলে অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষদের বাগে আনতে অহংপুষ্ট আর্য শক্তিকেও যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তার বিশ্ববিশ্রুত ভারতের ধর্মসমূহ' গ্রন্থে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। আর্য অথবা ব্রাহ্মণ্য শক্তি যে সকল জনগোষ্ঠীকে পদদলিত করে এদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাদেরকে একেবারে চিরতরে জন্ম-জন্মান্তরের দাস বলে চিহ্নিত করেছে। আর যে সকল শক্তি ওই আর্য শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তাদের সকলকেই মর্যাদার আসন দিতে কোনো প্রকারের দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেনি। শক, হুন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ যারাই এসেছে এদেশে তাদের সকলকেই একেকটি মর্যাদার আসন প্রদান করেছে। রাজ্যবিস্তারে প্রশাসনে তাদের সহায়তা করতে পিছপা হয়নি। কিন্তু নিজেরা বাহুবলে যাদের পরাজিত করেছিল তারাও যে মানুষ একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা খুব অল্পই অনুভব করেছেন । তবু ভারতবর্ষে এমনকি এই বাংলাদেশেও যে, কোনো

কোনো নিচু শ্রেণীর লোক নানা বৃত্তি এবং পেশাকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে উপরের শ্রেণীতে উঠে আসতে পেরেছেন তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়।

বাংলাদেশের এই পরাজিত জনগোষ্ঠী যাদেরকে রাজশক্তি পাশবিক শক্তির সাহায্যে অন্ত্যজ করে রাখা হয়েছিল, তাদেরই সকলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সে প্রাথমিক পরাজয়ের কিঞ্চিত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন । শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন আর্য ধর্মের নব জীবন প্রাপ্তির পর বৌদ্ধদের এদেশে ধন প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো, তার অব্যবহিত পরেই এদেশে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথাই এদেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিমতম উৎস। কেউ কেউ অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাম্প্রদায়িকতার জনয়িতা মনে করেন। তারা ভারতীয় ইতিহাসের অতীতকে শুধু ব্রিটিশ শাসনের দুশ বছরের মধ্যে সীমিত রাখেন বলেই এই ভুলটা করে থাকেন।

.

৭.

বাঙালি মুসলমানরা শুরু থেকেই তাদের আর্থিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্দশার হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমাগত ধর্ম পরিবর্তন করে আসছিলেন। কিন্তু ধর্ম

পরিবর্তনের কারণে তাদের মধ্যে একটা সামজিক প্রভুত্ব অর্জনের উন্মেষ হলেও জাগতিক দুর্দশার অবসান ঘটেনি। বাংলাদেশে নতুন নতুন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেহেতু মৌলিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেনি, তাই রাজশক্তিকেও পুরনো সমাজ সংগঠনকে মেনে নিতে হয়েছে। সে জন্যেই মুসলিম শাসনামলেও বাঙালি মুসলমানেরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিগৃহীত ছিলেন। ইংরেজ আমলে উঁচু শ্রেণীর মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়িত হলে উঁচু বর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই সে আসন পূরণ করে।

বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের লোক। তাদের মানসিকতার মধ্যেও আদিম সমাজের চিন্তন পদ্ধতির লক্ষণসমূহ সুপ্রকট। বার বার ধর্ম পরিবর্তন করার পরেও বাইরের দিক ছাড়া তাদের বিশ্বাস এবং মানসিকতার মৌলবস্তুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। দিনের পর দিন গিয়েছে, নতুন ভাবাদর্শ এদেশে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এদেশে নতুন শাসনপদ্ধতি চালু করেছেন, কিন্তু তারা মনের দিক দিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের মতোই বার বার বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালি মুসলমান এবং মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাদের মানসে যে একটি বলবন্ত সামজিক আকাক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তাদেরই রচিত পুঁথিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাব্য সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার অনুসারে হয়তো এসকল পুঁথির বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের

নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এসবের মূল্য যে অপরিসীম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতালীয় দার্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচের মতে প্রতিটি জাতির এমন কতিপয় সামাজিক আবেগ আছে যার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্যাসের আকারে পুরোমাত্রায় বিরাজমান থাকে, রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে সে আবেগ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে এবং কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে সে আবেগই ফণা মেলে হুংকার দিয়ে ওঠে। সাহিত্যেই এই প্রথমে জাতিগত আকাক্ষার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। জাতিগত আকাক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে কোনো মহৎ সাহিত্য যে সৃষ্টি হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য।

পুঁথিসাহিত্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, বাঙালি আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের মনটি রাজশক্তির আনুকূল্য অনুভব করে হুংকার দিয়ে ফণা মেলে জেগে উঠেছে। কিন্তু ঐ জেগে ওঠাই সার, সে মন কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতাসমূহ সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। সমাজ সংগঠন ভেঙে ফেলে নব রূপায়ণ তারা ঘটাতে পারেননি। কারণ মুসলিম শাসকেরাও স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে যে নেতৃশ্রেণী সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি এবং আচারগত দূরত্বের দরুন শাসকশ্রেণীর অভ্যাস, মনন রপ্ত করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাঙালি মুসলমান।

ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পরে এই দেশে হিন্দুসমাজের ভেতর থেকে যে একটি মধ্যবিত্ত নেতৃশ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্যে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব প্রায় না থাকার কারণ হিসেবে শুধু ব্রিটিশের 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি' কিংবা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজের অন্ধবিদ্বেষকে ধরে নিলে মুসলিম সমাজের তুলনামূলকভাবে পেছনে পড়ে থাকার কারণসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা করা হবে না ।

.

৮.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান যুগে ইউরোপীয় ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নানা আধুনিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক চিন্তারাশি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তা মুসলমান সমাজকে স্পর্শও করতে পারেনি। আধুনিক যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যে সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক মূল্যচেতনার নেতৃত্ব হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী দান করেছিলেন, মুসলমান সমাজে তা একেবারে প্রসার লাভ করেনি । জগৎ এবং জীবনের যে সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন নবযুগের আলোকে তারা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন, মুসলমান সমাজ তার কিছুই গ্রহণ করেনি। সে সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ যে সকল মুসলিম চিন্তানায়ক মুসলমানদের হয়ে কথা বলছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন,

মুসলমান সমাজের প্রকৃত দাবি কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চিন্তা করার কোনো অবকাশই পাননি। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সংস্কার বলতে তাদের মনে প্রভুত্ব হারানো উঁচু কোটির মুসলমানদের কথাই জাগরুক ছিল।

স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে যে অধিকারচেতনা অপেক্ষাকৃত পরে জাগ্রত হয়, আসলে তা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের আন্দোলন এবং অগ্রগতির সম্প্রসারণ মাত্র। তাদেরকে তা করতে গিয়ে দু-ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। লেখাপড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থস্বার্থের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো এবং অন্যদিকে উঁচুতলার মুসলমানদের মূল্যচেতনা এবং জীবনদৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। এই দু-মুখী প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করতে হলে যে শক্ত সামাজিক ভিত্তিভূমির প্রয়োজন ছিল,তাদের পেছনে ছিল না। তাই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে থেকেও ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ নিয়ে যারা উপরে উঠে আসতেন, উঁচুতলার মুসলমানদের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তারা নিজেদের সংযুক্ত করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন থেকে শুরু করে জামালুদ্দিন আফগানীর 'প্যান ইসলামিজম' পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে আসা সমস্ত আন্দোলন প্রবর্তনার সঙ্গে নিজেদের অংশীদার করে নিতেন। কিন্তু স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন একান্তভাবে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যলঘিষ্ঠ মুসলমান সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। আবার এই সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে জনগণের শ্রেণীগত তফাত ছাড়া ভাষা সংস্কৃতিগত পার্থক্য যে ছিল না একথা বিংশ শতাব্দীতেও ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানেরা খুব কমই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তারা

বাঙালি মুসলমানের মধ্যে অনুরূপ সমাজচেতনা এবং মূল্যবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাঙালি জনগণের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক বিরহিত ছিল যে ভাবাদর্শিক কোনো জাগরণ আনতেই পারেনি। ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সংস্কারকে আঘাত করে এমন কোনো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে জেগে উঠতে পারেনি। মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামজিক কর্মকাণ্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক।

হিন্দু সমাজে যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন হয়নি একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাদের একাংশের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ মৌলিক চিন্তা করেছিলেন এবং সামাজিক অনেকগুলো বদ্ধমতকে শাণিত আক্রমণ করেছিলেন, বাস্তবে না হলেও তত্ত্বগত দিক দিয়ে বেশ কিছুদূর যুক্তিবাদিতার চর্চা তাদের মধ্যে হয়েছে। তাদের কৃত আন্দোলনসমূহ যে সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষে ফসফরাসের মতো জ্বলেছে, সমাজের গভীরে প্রবিষ্ট হতে পারেনি, তার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে যুক্তিবাদিতার চাষ একেবারে হয়নি। নতুন যুগের আলোক জগৎ এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করে সমাজের সামনে তুলে ধরছেন এমন মানুষ সত্যিই বিরল। মুসলমান সমাজে যে কোনো মনীষী জন্মাতে পারেননি কারণ সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি কিংবা ত্রি-মুখীনতা। সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহের মধ্যেই বিভিন্নমুখী লক্ষ্যের কারণসমূহ সংগুপ্ত ছিল।

.

৯.

বাঙালি মুসলমান বলতে যাদের বোঝায়, তারা মাত্র দুটি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার একটি তীতুমীরের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত ওহাবী আন্দোলন। অন্যটি হাজী দুদুমিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন। এই দুটি আন্দোলনেই বাঙালি মুসলমানেরা মনেপ্রাণে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু উঁচু শ্রেণীর মুসলমানেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলেও কৃষক জনগণই ছিলেন এই আন্দোলন দুটির হোতা। আধুনিক কোনো রাষ্ট্র কিংবা সমাজদর্শন এই আন্দোলন দুটিকে চালনা করেনি। ধর্মই ছিল একমাত্র চালিকাশক্তি। সে সময়ে বাংলাদেশে আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কিত বোধের উন্মেষ ঘটেনি বললেই চলে। সমাজের নিচুতলার কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার জন্য ধর্মই ছিল একমাত্র কার্যকর শক্তি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই আন্দোলন দুটির ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাগামী ছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

এই আন্দোলন দুটি ছাড়া অন্য প্রায় সমস্ত আন্দোলন হয়তো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, নয়তো হিন্দু সমাজের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রয়াসের সম্প্রসারণ হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সমাজের মৌল ধারাটিকে কোনো কিছুই প্রভাবিত করেনি। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের মনটিতে একটু রং-টং লাগলেও কোনো রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়নি। আমরা দেখেছি শহীদে কারবালার ব্রাহ্মণ আজর উনবিংশ শতাব্দীর মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু'তেও একই স্থানে, একই পোশাকে, একই চেহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মধ্যিখানে কয়েকটি

শতাব্দীর পরিবর্তন কোনো ভাবান্তর আনতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতেও এই মনের বিশেষ হেরফের ঘটেনি। বাঙালি মুসলমানের রচিত কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি ধরা পড়বে। কোনো বিষয়েই তারা উল্লেখ্য কোনো মৌলিক অবদান রাখতে পারেননি। সত্য বটে, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন প্রমুখ কবি কাব্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে, উভয়েরই রচনায় চিন্তার চাইতে আবেগের অংশ অধিক। তাছাড়া এই দুই কবির প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী ছিল হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ নয়।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হয়তো চর্বিতচর্বণ নয়তো ধর্মীয় পুনর্জাগরণ। এর বাইরে চিন্তা, যুক্তি এবং মনীষার সাহায্যে সামজিক ডগমা বা বদ্ধমতসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন, তেমন লেখক কবি মুসলমান সমাজে আসেননি। বাঙালি মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে। তার মনের আদিম সংস্কারগুলো কাটেনি। সে কিছুই গ্রহণ করে না মনের গভীরে। ভাসা ভাসাভাবে, অনেক কিছুই জানার ভান করে, আসলে তার জানাশোনার পরিধি খুবই সংকুচিত। বাঙালি মুসলমানের মন' এখনো একেবারে অপরিণত, সবচেয়ে মজার কথা এ-কথাটা ভুলে থাকার জন্যই সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে কসুর করে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রসারমান যান্ত্রিক কৃৎকৌশল স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করছে এবং তার একাংশ সুফলগুলোও ভোগ করছে, ফলে তার অবস্থা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এঁচড়েপাকা শিশুর মতো। অনেক কিছুরই সে সংবাদ জানে, কিন্তু কোনো কিছুকে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে,

মনীষা দিয়ে আপনার করতে জানে না। যখনই কোনো ব্যবস্থার মধ্যে কোনোরকম অসঙ্গতি দেখা দেয়, গোঁজামিল দিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এবং এই গোজামিল দিতে পারাটাকে রীতিমতো প্রতিভাবানের কর্ম বলে মনে করে। শিশুর মতো যা কিছু হাতের কাছে, চোখের সামনে আসে, তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট, দূরদর্শিতা তার একেবারেই নেই। কেননা একমাত্র চিন্তাশীল মনই আগামীকাল কি ঘটবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে জানে । বাঙালি মুসলমান বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি ঢেকে রাখার যাবতীয় প্রয়াসকে তার কৃষ্টি কালচার বলে পরিচিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বাঙালি মুসলমানের সামাজিক সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি চোখ বুলোলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সাবালক মন থেকেই উন্নত স্তরের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে তার মনের সাবালকত্বের কোনো পরিচয় রাখতে পারেনি। যে জাতি উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারে না, অথবা সেগুলোকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে দিয়ে উন্নত রাষ্ট্র সৃষ্টিও সম্ভব নয়। যে নিজের বিষয় নিজে চিন্তা করতে জানে না, নিজের ভালমন্দ নিরূপণ করতে অক্ষম, অপরের পরামর্শ এবং শোনা কথায় যার সমস্ত কাজকারবার চলে, তাকে খোলা থেকে আগুনে, কিংবা আগুন থেকে খোলায়, এইভাবে পর্যায়ক্রমে লাফ দিতেই হয়। সুবিধার কথা হলো নিজের পঙ্গুত্বের জন্য সব সময়েই দায়ী-করবার মতো কাউকে না কাউকে পেয়ে যায়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার উৎসটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না।

বাঙালি মুসলমানদের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালি হওয়ার জন্যও নয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুন তার মনের উপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত রয়েছে, সজ্ঞানে তার বাইরে সে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু-বছরে কিংবা চার বছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের মনের ধরন-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন ও মনীষার এক অংশ মাত্র সাধারণের চোখে পড়েছে। অপর অংশ চাঁদের অপর পিঠের মতো লোকলোচনের অন্তরালে রয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীর মাত্র চল্লিশজন বিশারদ লোক নাকি 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' পড়েছেন। তাদের সকলে যে রাসেলের সূক্ষ্ম চিন্তাপদ্ধতির সূক্ষ্ম তন্তু পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছেন এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারেননি। দর্শনে তার নিজস্ব অবদান 'থিয়োরি অফ ডেসক্রিপশন' প্রসঙ্গেও এ কথা অতটা না হলেও অল্পবিস্তর খাটে। জনপ্রিয় রচনাসমূহ সাধারণ মানুষের কাছে এনেছে তাকে- একথা সত্য বটে। কিন্তু আসল রাসেল মানুষটিকে তার মধ্যে পাওয়া যাবে না। রচনারীতির সরল ভঙ্গি এবং ঋজু বক্তব্যের মতো মানবিক ভাবাবেগের শূরণের মাধ্যমে যেন জনসভায় জানান দিতে চেয়েছেন তাদেরই একজন তিনি। মনের গুঞ্জরণশীল ভাবনাগুলো আলাদা করে হেঁকে হেঁকে সঠিকভাষায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাসহকারে তরজমা করতে পেরেছেন বলেই তিনি মোটামুটি ভাবনা চিন্তা করতে সক্ষম মানুষের মনেও একটা আসন অনেকটা জোর করে আদায় করে নিয়েছেন। লোকমনরঞ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি লিখেননি। বরং বলা চলে অনেক সময়েই বেশির ভাগ মানুষের সংস্কার বিশ্বাস এবং চিন্তন পদ্ধতির উপর খুব তীক্ষ্ণ আক্রমণ চালিয়েছেন।

এখানে ধরা পড়ে রাসেলের লক্ষ্য করবার মতো একটি বিশেষত্ব। আক্রমণ করার যে একটা পালোয়ানী বা খেলোয়াড়ী উল্লাস থাকে, তা রাসেলের নেই। ব্যথিত হয়েছেন

অনেক সময়, কিন্তু ধৈর্য হারিয়েছেন কম সময়। তার পছন্দ এবং অপছন্দের সীমানাও তিনি টানেন নিজের ভঙ্গিতে। কোনো কিছু মনঃপূত না হলে তিনি কারণ বলে দেন। বিষয়টি তার মনঃপূত নয়, যেহেতু তার ধারণাতে বিষয়টি মানুষের শরীর মনের সুস্থ বিকাশের অনুকূল নয়, যুক্তিগুলো থরে থরে সাজিয়ে বিন্যাস করে দেখাবেন। রাসেলের উইট হীরার ছুরি। ইচ্ছে করে কথা বলেন না, হঠাৎ কথা বলবার ঝেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। প্রচলিত অর্থে চমৎকার ধারালো ভারালোর কোনোটাই নয়। বার্নার্ডশ'র মতো ক্ষোভ মেশানো জ্যাঠামি দিয়ে লোক হাসানোর ইচ্ছা রাসেলের আদৌ নেই । তিনিও কিন্তু লোককে শিক্ষা দিতে চান। তাই বলে আগ্রহাতিশয্য তার নেই। মানুষের জানা প্রয়োজন, ইচ্ছে করলে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। তাই রাসেলীয় উইট ঝিলিক দিয়ে বুকে বেঁধে কিন্তু মুখে হাসি আসার আগে মনে চিন্তার শিকড় বাড়িয়ে দেয়। তার অপছন্দবোধ আছে সেটা কঠিন এবং হিমশীতল, মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত স্পর্শ করে। কিন্তু ঘৃণা? সম্ভবত তা তিনি করেন না।

তার মতের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছেন এমন মানুষও তার রচনারীতির প্রতি আকর্ষণ চেপে রাখতে পারেননি। তার বক্তব্য চতুর্মাত্রিক; তাতে স্পষ্টতার সঙ্গে তীক্ষ্ণতার মিলন ঘটেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই অর্জুনের মতো পাখির চোখ দেখে ফেলেন। কেউ তাকে গ্রহণ করুন না করুন ইচ্ছে- তার কাজ বিষয়টি ধরিয়ে দেয়া। তিনি কর্তব্যমাত্র পালন করছেন। অঙ্কবিদের নিখুঁত পরিপাট্যের সঙ্গে আরেকটি দুর্লভ গুণের মিশেল দিয়েছেন তিনি। যে গুণটি ধ্রুপদ সঙ্গীতের রস। বস্তুত সংখ্যার রোমাঞ্চ গাণিতিকের মনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমশ্রেণীর নিষ্কাম আবেগের জন্ম দেয়। কিন্তু তাদের অনেকেই এই গভীরতা

সন্ধানী জাফরানের ঘ্রাণ এবং অনুভূতির লাবণ্য অপরের কাছে তুলে ধরতে পারেন না। কিন্তু রাসেলের পারঙ্গমতা সন্দেহের অতীত। তার মানবিক আবেগের স্পর্শলাগা রচনাগুলো পাঠের পর মনে রসিয়ে ওঠে ধ্রুপদ সঙ্গীতের করুণ মূর্ছনা। মন চারধারে আপনা থেকেই প্রকাশিত করে শান্তশীতল এলানো ছায়া। মরুভূমির মধ্যে উদ্যানকুঞ্জের মতো। বলতে সাধ হয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অঙ্কবিদ যাই হোক না কেন এই ঋজুরেখ চিন্তার অধিকারী ধাতব কঠিন মানুষটির মধ্যে এমন কেউ কোথাও একজন আছেন, যাকে সেক্সপীয়র, শেলীর জাতভাই বলতে পারি।

শুধু রচনারীতির উপর যাদের নাম ধাম খ্যাতি, রাসেল সে জাতীয় পুরুষ নন। সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝায় প্রবল সামুদ্রিক তিমির মতো যুঝেছেন। তার অস্ত্রলেখা বীরত্বের প্রতাঁকের মতো সকল গতরে ছড়ানো রয়েছে। অর্ডসওয়ার্থ নিউটন সম্বন্ধে যা বলেছেন Voyazing alone in the Ocean of thought, রাসেলের ব্যাপারেও কথাটা লাগসই। তা ঠিক, রাসেলের আরেকটি দিকও রয়েছে। নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের জীবন রাসেলের নয়। একা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে মুক্তো মানিক তুলেছেন এমন অনেকে আছেন। শিগগির কিংবা দেরিতে তাদের অবদান মানব সমাজ গ্রহণ করেছে। রাসেল চিন্তানায়ক, একাকীত্বের বিষণ্ণ বেদনা অনেক চিন্তানায়কের প্রিয়তম সুহৃদ। চিন্তাভাবনার জগতে ক্ষ্যাপার পরশপাথর সন্ধান করেছেন তিনি। কিন্তু নিজে তিনি হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন এমন একটা স্বর যা শুধু অরণ্যে আর্তনাদ করবে না। লোকালয়ে, নগরে-জনপদে, মানুষের নিবাসকুঞ্জে ধ্বনিত হবে সে স্বর নিটোল নিঝর আওয়াজের মতো এবং মানুষ দেবে তার

সানন্দ উত্তর। মানুষের আবেগে চিন্তায় আসার আকুল আকুতি রাসেলকে প্যাচালো বিতর্কের পানে ঠেলে দিয়েছে।

মানুষ মাত্রেই কতেক সীমিত নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তার চৌহদ্দী ডিঙানোর আকুতি যার মধ্যে যত বেশি প্রবল, পশুর সঙ্গে তার প্রভেদও তত স্পষ্ট অর্থাৎ তিনি অনেক বেশি মানুষ। ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করার এ অনিভন্ত উদ্দীপনাকে বলা যেতে পারে মানুষী সত্তার প্রমিথিয়ান রশ্মি । যারা অসাধারণ তাদের মধ্যে এ আগুন অনেক বেশি তেজোময়। চেতনার বলয়ে অন্তর্জানের বেশে যে শিখা অবস্থান করে তার আলোতে বস্তুজগৎ, সমাজ-জগৎ এবং মনোজগতের উত্তরণের ভাবী কটি ধাপ আগাম প্রতিফলিত হয়। বদ্ধ দরজার ফুটো দিয়ে তেরছা হয়ে যে কটি আলোকরেখা চোখে পড়েছে তার ওপাশে কি জানার জন্য, দেখার জন্য, অনুভব করার জন্য অন্তরাত্মা আকুল হয়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত রক্ত পরামর্শ করে উজান যেতে চায়। এক ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অস্থিরতা লোমকূপে রি-রি করে কাঁপে। কিন্তু মানুষ সবসময় তালা খুলতে পারে না। সব সময় রহস্যভেদ করতে পারে না, সমস্ত জীবনের উদ্যম প্রচণ্ড ব্যর্থতার অপঘাতে ধুলোকাদায় গড়াগড়ি করে। সুন্দরীর এলোকেশের মতো রহস্য জট পাকিয়ে যায়- অন্তরালের সুন্দরী ডাকে আয় আয়। মানুষ ছোটে তুরঙ্গম গতিতে। সীমিত বুদ্ধির পুঁজি নিঃশেষিত হয়, পথরেখার দুপাশে পড়ে থাকে সাদা হাড়, মাথার খুলি। সে পথে আবার যায় যাত্রী।

বস্তুত রহস্য ভেদ করবার জন্য যে ধরনের বলবান শীলিত বুদ্ধির প্রয়োজন তা অনেকের থাকে না, নানা কিছুই বুদ্ধির সতীত্ব হরণ করে। বংশক্রম, শ্রেণী, পেশা, জলবায়ু, দেশ,

কাল, ধর্ম এবং রাষ্ট্র সবকিছু একযোগে বুদ্ধিবৃত্তির সতীত্ব নাশ করার মানসে ওঁত পেতে রয়েছে। সেগুলো চেকন চেকন লতার নাগপাশের মতো বুদ্ধির শীর্ষ এপাশে না হয় ওপাশে হেলিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যপ্রদ সূর্যালোকে অভিসার করতে পারে না। এসব কিছুর দড়াদড়ি ছিঁড়ে বুদ্ধিকে প্রাকৃতিক সত্যের মতো করে বিকশিত করাই হলো বিজ্ঞানবুদ্ধি। মানুষ কি বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হতে পারে? প্রখর ইচ্ছে দিয়ে চেষ্টা করলেও পরিশীলন সে আনতে পারে? জন্ম এবং মৃত্যুর পরাক্রান্ত সীমানা মেনে নিয়ে কাজে নামতে হয়। তার জন্মের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। যে মানুষের খেয়াল খুশিতে তার জন্ম তাদের কাছ থেকে পাওয়া রক্তধারার মধ্য দিয়ে সে তাদেরই সংস্কারের বীজাণু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে অসহায় মানব শিশু মা বাপ সমাজ সংস্কৃতি থেকে স্নেহ, প্রেম, রাগ, অনুরাগ, ক্ষোভ-দ্বেষ, বিদ্রোহ বিপ্লবের মাধ্যমে যা গ্রহণ করে, যেসব সংস্কারের জাল তাকে আটকে ধরে । জীবনকে বলা যেতে পারে চলিষ্ণু উদ্ভিদ। আবার আরেক নামেও ডাকা যায়- চিন্তান্বিত কামনা। এখন কথা দাঁড়ালো চিন্তান্বিত কামনা তরুর গতিবিধি কতদূর পর্যন্ত স্বকীয় চেষ্টা উদ্যম এবং শ্রমে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে মানুষ। শিয়রে তো মৃত্যু পরোয়ানা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সুদীর্ঘ দিন সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে মেজে ঘষে অবচেতনকে চেতনের স্তরে এনে সত্য মিথ্যা পরখ করে দেখবে সে ফুল্ল অবসর কই? তবু মানুষ এ সংকীর্ণ সময়সীমার বাঁধনের মধ্যে নিজের বুদ্ধি এবং বোধির স্বরূপ যতদূর উপলব্ধি করতে পারে, সিদ্ধি ততদূর।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সীমিতি কতদূর এবং তা ভাঙার জন্য তার চেষ্টা কত বেশি শানানো এবং পরিকল্পনা কতদূর নিখুঁত– উপলব্ধির জন্য আশা করি উপরের কথা কটির প্রয়োজন আছে।

রাসেল জন্মেছিলেন ইংল্যান্ডের এক বনেদী পরিবারে। তার পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ কীর্তিমান ছিলেন। তার বাবা এবং এক জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া পরিবারের সকলে ছিলেন আচারনিষ্ঠ খ্রিস্টান। খুব ছোট বয়সে রাসেল মা বাবা দুজনকে হারান। তাই পিতামহ এবং পিতামহীর আশ্রয়ে তাকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। তারা প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করে তোলেন। রাসেলের চরিত্রে এবং ব্যক্তিত্বে খাঁটি খ্রিস্টানের কিছুটা রেশ রয়ে গিয়েছে তাই। সে সময়টা ছিল রাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। ঐতিহাসিকেরা রাণী এলিজাবেথের যুগ থেকে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রসারিত সময়কে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময়ে বাকি চারটি মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। ইংল্যান্ডের যা গর্বের বস্তু শিল্পকলা, দর্শন এবং যন্ত্রশিল্প ঐ সময়েই বিকশিত হয়। অভিজাত শ্রেণীর ইংরেজ ভদ্রলোক যে জাতিক ও শ্রেণীক বীরত্বের ব্যঞ্জনা মধ্যদিনের অলস স্বপ্নে, বলনাচের আসরে অনুভব করতেন সে পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন রাসেল। বুর্জোয়ার উন্মেষ যুগের স্বপ্ন কল্পনার উদ্দামতা যার শিল্প সংস্কৃতির শিরায় উপশিরায় তাজা শোণিতের মতো প্রবাহিনী ছিল; বর্তমান যুগে পটের স্থির চিত্রের মতো স্থবির নিশ্চল হতে পারে, কিন্তু তারও ছিল যৌবন দিন। রাসেল সম্পর্কে আরেকটি তথ্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নইলে তার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের আসল চেহারাটি ধরা নাও পড়তে পারে। তার বাবা ছিলেন নাস্তিক। তিনি উইলে লিখে

গিয়েছিলেন, তার সন্তানদের শিক্ষা যেন ধর্মনিরপেক্ষভাবে দেয়া হয়। পরে এ সম্পর্কে অবহিত হলে রাসেলের মনে ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি নাস্তিকতা পেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে রাসেল ছাত্র হয়ে আসেন। তার পাঠ্য বিষয় দর্শন। তিনি জার্মান ক্লাসিক্যাল দর্শনের শিরোমণি হেগেলের রচনার সংস্পর্শে আসেন। নব্য হেগেলীয়দের বিশিষ্ট একজন হিসেবে খুব শিগগির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন মার্কস এঙ্গেলসের উদ্ভাবিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রূঢ় কঠোর আঘাতে গোটা মহাদেশে হেগেলীয় দর্শন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছিল। মার্কসীয় চিন্তার প্রভাবে জার্মানি প্রভৃতি দেশে সংঘবদ্ধ শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। রাসেল যেহেতু শৈশবে খুবই নিঃসঙ্গ থেকেছেন, সম্ভবত সে কারণে শিগগিরই হেগেলের দর্শনের বাক সর্বস্বতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন। ঝুঁকলেন অঙ্কের দিকে। তখন কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় নতুন যান্ত্রিক দর্শন এবং মরমী দর্শনের স্ফুরণ হতে লেগেছে। রাসেলের যৌবনেই কাইজারের জার্মানি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাবৎ ইউরোপীয় শক্তি সে যুদ্ধে এপক্ষ ওপক্ষে অংশ নিয়েছে। লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা জারের রাশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এ সমস্ত বিষয় একযোগে রাসেল মানুষটির অন্তর্লোকে রেখেছে গভীর অনপনেয় স্বাক্ষর।

উপরের ঘটনাপ্রবাহ ও ভাবনাস্রোতের নিরিখে রাসেল চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তার মহত্ব বিরাটত্ব বুঝতে পারব এমনকি তার অসঙ্গতিগুলোও বিচার করতে পারব। প্রথমত তিনি

ইংরেজ। ইংরেজরা বিপজ্জনক রকমের প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। সম্ভবত ভুয়োদর্শনের প্রতি অধিক ঝোঁকের কারণেই সমস্ত ইংরেজ জাতি একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর এবং এক হবস্ বাদে কোনো বিশাল কল্পনার দার্শনিক সৃজন করতে পারেনি। বস্তুর প্রতি মোহ এবং অবারিত কল্পনার প্রতি সন্দেহসূচক দৃষ্টিভঙ্গি ইংরেজ জাতের একচেটে রাসেলেরও তা আছে। আত্মকথার গোড়ার দিকে তিনি তা স্বীকার করেছেন; ভিক্টোরিয়া যুগের বনেদী ইংরেজের রুচি তার চরিত্রের গড়নে রেশমী বস্ত্রের সুন্দর কারুকর্মের মতো ফুটে রয়েছে। নানা পরিবর্তন রূপান্তরের মধ্যেও রঙছুট হয়নি। আর সে যুগে দার্শনিকেরা মনে করতেন যুক্তির মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সমাধান সম্ভব। তাকে তাও প্রভাবিত করেছে। শ্রেণীগতভাবে তিনি অভিজাত ছিলেন, কতেক কোমল মানবিক অনুভূতি এবং মানুষোচিত হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়ার নগদ টাকার সম্পর্কে এ সম্বন্ধের উপর প্রচণ্ড একটা আঘাত হেনেছে। অভিজাত কুলে জন্ম চিরকালের জন্য তার বিপজ্জনক বিপ্লবী হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই দেখা গেছে চূড়ান্ত সময়ে যখন ঘটনাস্রোত অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা অপরিহার্য করে তুলেছে তখনো রাসেল দুরূহ পরিশ্রম করে যুক্তি বের করে আনছেন। যে যুক্তি রাসেলের জন্য সত্য ছিল পৃথিবী তা গ্রহণ করেনি। ঘটনা ঘটেছে নিজের নিয়মে। রাসেলকে পুরনো যুক্তি আবার নতুন করে ঝালাই করে নিতে হয়েছে। ঘটনাস্রোতের বেগ বার বার যুক্তির গোছালো সুতো আউলা করেছে। বুদ্ধির ভাষা বোঝেন এমন সব মানুষও বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, এখানেই রয়েছে তাকে ভুল বোঝার উৎস।

কৈশোরের নিঃসঙ্গতা নিঃসন্দেহে তার মনে প্রশ্নশীলতার বীজ বপন করেছিল। ট্রিনিটি কলেজের জ্ঞানের উত্তাপিত আবেষ্টনীর মধ্যে তার সবল অঙ্কুরণ লক্ষ্য করার মতো। রাসেলের সৌভাগ্য তিনি অনেকগুলো যুগান্তকারী প্রতিভার সঙ্গে মানসিক আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন। দার্শনিক জি. ই. মুর, অর্থনীতিবিদ কিস্ এবং আরো অনেক যুগন্ধর প্রতিভা তার বন্ধু ছিলেন।

আশ্বস্ত প্রতিবেশ যুবকের লজ্জা কেড়ে নিল, সে সঙ্গে নিল আল্লাহ এবং খ্রিস্টধর্মের প্রতি আস্থা। ভেতরের স্বেচ্ছাচারী শক্তি নিজের পথ কেটে প্রবাহিত হলো। হেগেলের ইতিহাসের দর্শনকে তো অগ্রাহ্য করলেনই এমনকি অন্যান্য দার্শনিকের ওভারকোটেও আত্মগোপন করলেন না। তার অন্দ্রি সন্ধান শিগগির জগতকে দেখার, বোঝার, বিচার করার, ঘটনা ব্যাখ্যা করার নিজস্ব একটা ভঙ্গি উদ্ভাবন করল।

আনাড়ির চোখেও ধরা পড়বে জার্মান ক্লাসিক্যাল দর্শন থেকে তিনি কতটুকু সরে এসেছেন। রাসেলের দর্শনে মৌলিক অবদান, থিয়োরি অব ডেসক্রিপসনের বিবরণ অল্প কথায় দেয়া সম্ভব নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়ের একটা প্রাথমিক ধারণা মাত্র দেয়া যেতে পারে। ধরুন, একটা চোখ। তার বিশেষ আকার, বিশেষ গড়নভঙ্গি আর রয়েছে যান্ত্রিক নির্মাণশৈলী । সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রভাবে বাইরের আলোকের প্রতিফলনে সক্ষম। যে যন্ত্রটির মাধ্যমে সম্পাদন করে এ প্রতিফলন কর্ম তাকে বলা যেতে পারে অক্ষিগোলক। এর প্রতিফলন কর্মকেই আমরা বলি দেখা। কিন্তু হেগেলীয় দর্শন চোখকে দেখবে অন্যভাবে। চোখের কোনো আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার না করে বলবে

চোখ মানব শরীরের একটা অংশ। ব্যক্তি মানুষ আবার সমাজ মানুষের একটি অংশ। সমাজ যখন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখনই আসে সাবালকত্ব। তার মতে রাষ্ট্র মানুষের হাতে গড়া ঐশী প্রেরণার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। ওখানে তিনি থামেননি। বিষয়টি অনেকদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছেন। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ক্ষতিকর নয় বরং লাভজনক। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেই ঐশী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে । হেগেল জীবনে প্রাশিয়ার বাইরে যাননি, তাই জার্মান রাষ্ট্রকেই বিশ্বরাষ্ট্র বুঝতেন। এখনো হয়নি হওয়ার পথে। প্রমাণ করার জন্য বিরাট বিরাট কেতাব লিখেছিলেন। তার একটা প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ছিল দর্শনের অন্তরালে, সম্রাট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে যদি যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে শিগগির বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বলা বাহুল্য, সে কর্মটি কাইজার এবং হিটলার উভয়ে করেছিলেন। হেগেলের দর্শন নিঃসন্দেহে প্রকাণ্ড মানব চিন্তার প্রকাশ। কিন্তু রাসেলের সে চোখের ব্যাপারটির কোনো সমাধান নেই তাতে।

বিষয়কে ধরে দেখা, ছুঁয়ে দেখার ইংরেজসুলভ প্রাকটিক্যালিটি তাকে হেগেলের দর্শনের স্বর্গীয় উন্মাদনা থেকে রক্ষা করেছে। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তত্ত্বের নিরিখে বার বার প্রায়োগিক দিকটি যাচিয়ে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। বলতে হয় তার দর্শনের এই ভঙ্গিটি তাকে করে তুলেছে সংশয়বাদী। প্রশ্ন না করে বিচার না করে কোনো কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নন। শুরুতে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখেছেন বলে লোকে ভুল বুঝেছে, কিন্তু মনটা বাঁকা ছিল না। রাসেলের দর্শনটি নমনীয় নয়। মানুষকে জ্ঞানী, বিচারশীল এবং সহনশীল করার মোক্ষম অস্ত্র। জ্ঞানী করা এবং হয়ে ওঠা এক নয়। শুধু কেতাবের বিষয় হলে দর্শন এবং দার্শনিক দুয়ের সম্মান অটুট থাকে। দৈনন্দিন জীবনের বাঁকাচোরা, ব্যক্তিক,

জাতিক, আন্তর্জাতিক সমস্যার সামনে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকতে হলে দর্শন এবং দার্শনিক দুয়েরই ভাগ্যে গালমন্দ এমনকি শাস্তি পর্যন্ত জোটে। রাসেলেরও তা জুটেছে। তার দেখার দৃষ্টিতে যা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘটনা ঘটেছে ভিন্ন রকম। তাই রাসেলকে মত বদলাতে হয়েছে। তার অভিপ্রায় ছিল মানুষের অন্তরের সত্য এবং জগতের সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত টেনে আনা। তাতে করে সাধারণ মানুষ তার চিন্তার সূত্র ধরতে পারেনি। অনুরাগী এবং বন্ধুজনের কাছেও রাসেলকে বিদঘুঁটে মনে হয়েছে। বস্তুত তিনি অঙ্ক, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের নীতি মাংসল মানুষের জগতে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। ঐ সকল শাস্ত্রে রাসেলের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সময় কার্যকরী। দলমত নির্বিশেষে অনেকেই মনে করেন, বিশেষ বিষয়ে তার মতামত অনেক বেশি মূল্যবান এবং তা যে টেকসই হবে দ্বিমত পোষণ করার মানুষ খুবই স্বল্প । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে উদারনৈতিক রাসেল স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে ধারণায় এসেছেন মার্কসবাদী ক্রিস্টোফার কডওয়েলও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

এখানে একটা জিনিস ভেবে দেখার রয়েছে। অন্যান্য নামকরা ব্রিটিশ মার্কিন বুদ্ধিজীবী, লেখক, চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক যেখানে আপোস করে খানাখন্দের মধ্যে অঘোষিতভাবে তলিয়ে গেলেন, অনুরূপ অবস্থায় রাসেল এগিয়ে আসতে পারলেন কেন? ডি.এইচ. লরেন্সের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি খনি মজুরের ছেলে। লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিতজনের প্রতি তার সমবেদনা অনেক বেশি বাস্তব এবং ঘনীভূত হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি হলেন, ফ্যাসীবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ এবং হাতুড়ে সুলভ যৌন সর্বস্বতাবাদের প্রবক্তা।

আমাদের গোড়ায় ফিরে যেতে হবে। সে সন্দেহ রাসেলকে সহজ বিশ্বাসী হতে দেয়নি- কঠিনের পূজারী করেছে তার বলেই রাসেল বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে লরেসের মধ্যে চিন্তা ছিল না, ছিল সংবেদনা অনর্গলিত পথেই তীব্র বেগে গ্যাসের মতো বেরিয়েছে। রাসেলের ভুলচুক আছে কিন্তু তিনি চলমান মানব। তার জীবনপথের ধ্রুব নক্ষত্র দুটি। এক সত্য, অন্য স্বাধীনতা। সত্য বলতে চ্যাপ্টা এবং গোলাকার যুগপৎ, সে রকম কোনো পদার্থ নিশ্চয়ই রাসেল মনে করতেন না। সত্য চলমান, সত্য সজীব, সত্য বাঁচার আনন্দে কবির কাব্যে, বিজ্ঞানীর গবেষণায়, শ্রমজীবী মানুষের ঘাম শ্রম সংগ্রামে নিত্য মুকুলিত হচ্ছে।

জ্ঞান এবং জীবনকেও তিনি দেখেছেন একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের জীবনের চারধারে যে অদেখা অন্ধকার কুহক সৃষ্টি করে, জ্ঞানের শাণিত তলোয়ারে হত্যা করে জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন প্রবাহিনী নদীরূপে। জীবন সুন্দর হবে, সুখী হবে, বলিষ্ঠ, ভাবনাসমৃদ্ধ হবে এবং আকাশের আয়তনে মাথাতোলা সবল ওকগাছের মতো বাড়বে; তাই তিনি জ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে কারাগার থেকে লেখা একটি চিঠিতে তা কিভাবে ধ্বনিত হয়েছে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

I want to stand at the rim of the world and peer into the darkness behind and see a little more than others have seen of the strange shapes of mystery that inhabit behind that unknown night. I want to bring back into the world of men some little bit of wisdom. There is

a little bit of wisdom in the world. Heraclitus, Spinoza and a saying here and there. I want to add to it, even if only ever so little.

এই কথা কটির মধ্যে রেনেসাঁ যুগের শিল্পী মিকালেঞ্জেলোর আদম মূর্তির সম্মোহিত তরুণের স্বপ্নময়তার সঙ্গে যে বলিষ্ঠ বাসনা ফুটে বেরিয়েছে- তেমন একজন মানুষের বুকের হৃদস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। যার কামনা প্রথম মানুষটির মতো অবশ্য বাইবেলীয় অর্থে নয়। তিনি পুরনো কোনোকিছুতে নির্ভর করতে চান না। অতীতের জ্ঞানীরা ধ্যান-দৃষ্টিতে যা দেখেছেন তার বাইরে দেখতে চান, বাড়াতে চান নিজের পৃথিবীর সীমানা। সে দেখা শুধু রাসেলের দেখা নয়- তার যুগ, তার জেনারেশনের দেখা। তাই যতই দিন যাবে রাসেল স্বচ্ছ হয়ে উঠবেন।

রাসেলের আত্মকথার পাঠকের দুটি নেহায়েত মামুলি টুকিটাকির প্রতি দৃষ্টি পড়তে পারে। প্রথম যৌবনে তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি কিছু কামনা করেননি। শুধু চেয়েছিলেন সন্তানের জনক হতে। একেবারে আদিম কামনা। জুলু হটেন্টটের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নেই। প্রথম সন্তানের জনক হওয়ার সংবাদ এমন বিভোর আনন্দে পরিবেশন করেছেন নেহায়েত জৈবকর্মে বিরক্ত মানুষের মনেও একঝলক দখিনা হাওয়া সমীরিত হয়। এই মানুষী আবেগটিই রাসেলের অমরত্বের কারণ। তিনি বিশাল পুরুষ, বিখ্যাত মানুষ। কণ্ঠস্বর আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে পাঁচ মহাদেশের কানে কানাকানি করে। এমন বিখ্যাত মানুষের আনন্দিত হওয়ার জন্য সুগায়কের গানের একটি কলি, জাতশিল্পীর ছবির একটু দর্শন, সবুজ বনানীর একটু অন্তরঙ্গ নিবিড় ছোঁয়া এই-ই যথেষ্ট। হাসি

পাওয়ার মতো সাধারণ। সমস্ত অসাধারণেরাই অতিবেশি সাধারণ, কথাটি বোধকরি সত্য।

ভবিষ্যতের ভাবনা

মানুষ গড়েছে সভ্যতা। রেশম কীট যেমন করে তন্ময় সাধনায় তৈরি করে গুটি। গত, গত যুগের মানুষের শ্রমের ভাষা, ধ্যানের ধ্বনি, বীর্যের ব্যঞ্জনা, আমাদের তন্ত্রীতে দোল দিয়েছে, জাগিয়ে তুলেছে ভাবনার সুবর্ণ লহরী। বিজ্ঞানের দীপ্তি, দর্শনের আলোক, সাহিত্যের মৈত্রী এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের সুচারু ব্যবস্থা আমাদের যুগকে করেছে মহীয়ান, মনীষাকে প্রখর এবং বুদ্ধিকে দিয়েছে মহাপৃথিবীর উদার দিগন্তে মুক্তি। নিজেকে এমন বিচিত্রভাবে জানার প্রয়াস আর কখনো দেখা যায়নি মানুষের ইতিহাসে। মানুষের বস্তুসঞ্জাত কল্পনা বস্তুর অন্তর থেকেই ঠিকরে বের করে এনেছে অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন পরমাণু কণা। বস্তুর সঙ্গে পরিচয়, বস্তুর শক্তিকে আয়ত্ত করার ইতিহাসই সভ্যতার ইতিহাস। তাতে প্রবল সৃষ্টিশীল আরেকটা জাগরণ কখন ঘটবে? যার অভিঘাতে মুছে যাবে মানুষের চোখের ঘোর। শুদ্ধরূপে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করে জীবনের সঙ্গে বস্তুর সার্থক মিতালী পাতাতে সক্ষম হবে মানুষ। মানুষে মানুষে সহজ সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে, চিন্তাকে আরো সূক্ষ্ম, আরো বস্তুনিষ্ঠ করার ভাবঘন মৈত্রীতে যুগের হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে এই বুঝি ফেটে পড়ে।

পূর্বপুরুষের সৃষ্টিশীল চেতনার স্পর্শ আমাদের চেতনাতে এসেছে হীরকের জ্যোতি আর সৃষ্টিশীলতায় জেগেছে নাড়া খাওয়া অনুরণন। একইভাবে উত্তর পুরুষ হিসেবে তাদের অন্তরলালিত তমিস্রারও আমরা উত্তরাধিকারী। আলো টানছে সামনে, অন্ধকার পেছনে।

এক দিকচিহ্নহীন গোলকধাঁধার বাসিন্দা এ যুগের মানুষ। সভ্যতার মহীরুহে কি নতুন মুকুল ধরবে? নাকি প্রকৃতির স্নেহ বন্ধন থেকে মূলশুদ্ধ খসে পড়বে প্রবালদ্বীপের মতো মানুষের গড়া এ সভ্যতা। তা আমরা জানিনে। জানিনে বলেই ভয়, জানিনে বলেই সংশয়। উত্তরণের পথ হয়তো আছে, কিন্তু আনাড়ির চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। বর্তমান মুহূর্তে মানুষের অসহায়তার দিকটাই প্রবল হয়ে চোখে পড়ছে। ইতিহাসের প্রত্যেক উত্তরণকালে অসহায়তাই যুগিয়েছে। সাহস, প্রেরণা দিয়েছে বাস্তবের মুখোমুখি কঠিন হয়ে দাঁড়াতে এবং মৈত্রী ভাবনায় উর্বরা করেছে মন। কিন্তু প্রত্যাসন্ন কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলবার যো নেই। কারণ যে কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সংকটকালে লড়েছে মানুষ, তাই-ই এখন টলটলায়মান। এখন প্রতিটি জাতি প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষের গোড়ায় জল ঢালতে গিয়ে সারা শরীর অস্ত্রময় রণোন্মাদ ডাইনোসরকুল যেমন ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল হয়েছে, মানবকুলেরও তেমনি একটা সামগ্রিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বৈকি!

ইতিহাসের অতীত থেকে মানুষ যুদ্ধ করে আসছে। কিন্তু পূর্বের যুদ্ধসমূহের ব্যাপ্তি ছিল সীমিত, বিশেষ জাতি এবং বিশেষ দেশের সীমানায়। তখনো মারণাস্ত্রের ব্যবহার হতো। দেদার মানুষ যেত মারা। বিধবা এবং পুত্রহীনা জননীর করুণ বিলাপ বাতাসে ধ্বনিত হতো। সমগ্র মানবজাতির বুকে তীব্র হলাহল মেশানো এতবড় একটা শক্তিশেল হয়ে কখনো দেখা দেয়নি যুদ্ধ। এরপর যদি যুদ্ধ লাগে অবস্থা কি হবে? সভ্যতার ভিত্তিমূল ধসে যাবে কিনা, প্রতিটি শান্তিপ্রিয় পৃথিবীবাসীর চোখে একটা বেদনার্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন

হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানুষের হাতে যে পরিমাণ অস্ত্র জমা আছে, শুধু সে-সবের সদ্ব্যবহার করলে আমাদের পৃথিবীর মতো কয়েকটি গ্রহকে জীবজন্তুহীন করে ফেলা মোটেও অসম্ভব নয়। যুদ্ধ যে লাগবে না, এমন কথা কে বলতে পারে? বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যায় উন্নত জাতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে জাগরণশীল জাতিগুলোও প্রতিরক্ষার ব্যয় বাড়িয়ে চলছে, জনসংখ্যর একাংশকে উপোস রেখে অস্ত্র ক্রয় করছে। কারিগরিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানে অল্প-স্বল্প দক্ষতা অর্জন করেছে, এমন অনেক জাতি রাতারাতি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য কাঁপালিক সাধনায় মেতে উঠেছে। বিশ্বের দিকে দিকে জমছে প্রচণ্ড উত্তাপ। স্নায়ুযুদ্ধের তলায় চাপা পড়ছে শুভবুদ্ধি। কোনো কোনো অঞ্চলের বিষধোয়া চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না ধোয়ার মধ্য থেকে আগুন জ্বলে ওঠার পুরোপুরি সম্ভাবনা বর্তমান। যদি তাই হয় সমগ্র জাতির জনসাধারণের কল্পনাকে খাট করে অথবা জাতিকে উপোস রেখে, হিংসা প্রতিহিংসার ওমে'তা দেয়া যে বোমাগুলো কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করে তৈরি করা হচ্ছে, সেগুলোর কি ব্যবহার হবে না? যদি না হয়,অপর্যাপ্ত অর্থ এবং মানুষের এযাবৎকালের বস্তুবীক্ষণের সবচাইতে সূক্ষ্ম সিদ্ধি যাতে মিশেছে সে মহামূল্য পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি দিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রনায়কেরা কি ব্রেকফাস্ট করবেন?

একদিকে গ্রহান্তরের শ্যামের বাঁশী, আরেকদিকে বিনাশের সর্বনাশা ইঙ্গিত । দুমেরুর কোন্ দিকে তাকাবে মানুষ? প্রত্যাশা নিয়ে অভাবনীয় সাফল্যের চূড়োর পানে তাকাতে দোষ নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি যুদ্ধ লেগে যায়, পারমাণবিক অস্ত্র ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে যায়, তাহলে তো সব কিছুর ইতি। আবার নৈরাশ্যবাদের সঙ্গে প্রেম জমিয়ে ধীরে ধীরে

অজগরের শ্বাসের টানে ছুটে চলা ভয়ার্ত হরিণের মতো এগিয়েও একই পরিণতিতে পৌঁছানো যায়। সুতরাং বিনা আয়াসে ভাবা যায়, রেশম কীটের মতো নিজের গড়া সভ্যতার আবেষ্টনীর মধ্যে, নিজেরই উদ্ভাবনী শক্তির তাপে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে মানুষ। কিন্তু মানুষ মানুষই, রেশম কীট নয়। সামগ্রিকভাবে মানুষকে দু-চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত করছে যে শক্তি সে হলো মানুষের শ্রম, সাধনা, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের পথ ধরে চিন্তা করলে মানব-সভ্যতার নতুন প্রত্যুষের কল্পনা করে চাঙ্গা হয়ে ওঠা যায়, আবার দান্তের নরকেও অবতরণ করা যায়। কোন পথ কাঙ্ক্ষিত?

স্বভাবতই মানুষ কল্যাণ চায়। অপরের কল্যাণ চাইবার মতো উদারতা এবং দূরদৃষ্টি অনেকের নেই, এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষ নিজের কল্যাণ, নিজের দেশের, নিজের জাতির,নিজের দলের কল্যাণ অবশ্যই চায়। এমনকি যুদ্ধ করার পেছনেও থাকে মানুষের আত্মকল্যাণবোধ। এ আত্মকল্যাণবোধের তাড়নায় জাতিসমূহ সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে, জনসংখ্যার একাংশকে উপোস রেখে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে। অতীতে জাতিসমূহ উকট আত্মকল্যাণবোধের তাগিদেই যুদ্ধ করেছে এবং বর্তমানেও সে একই বোধের উগ্র উন্মাদনায় যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ইতিহাস মানুষের খণ্ডিত কল্যাণবোধের ইতিহাস। আদিতে গোত্রদেবতাদের নামে, পরে ধর্মের নামে, তারপরে দেশের নামে, নীতির নামে, দর্শনের নামে,একটানা মানুষে মানুষে সংঘাত চলেই আসছে। অতীত ইতিহাসের রক্তমাখা অধ্যায়গুলোর দিকে তাকালে মানুষের ভেদবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতা স্পষ্টতই চোখে পড়ে। কি ঠুনকো কারণেই না একেকটি জাতি সংগ্রাম করেছে। যে দেবতা, ধর্ম, নীতি, দর্শন এবং সাম্রাজ্যের জন্য অপরের রক্ত

নিয়েছে এবং নিজের রক্ত ঢেলেছে মানুষ, তার প্রায় সবগুলো আজকে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। পূর্বযুগের বিশ্বাস, নীতি, মূল্যবোধ, দর্শন এবং জীবনচেতনা সম্পূর্ণভাবে পাল্টেছে। মানুষের সাধনা, শ্রম এবং প্রতিভার স্নিগ্ধ সাহস বিশ্বের এবং জীবনের প্রতি নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে অনুপ্রাণিত রয়েছে। তার ফলে পুরনো চিন্তার খাত বদলে নতুন প্রবাহে ধাবিত হয়েছে মানুষের চেতনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে হিটলার জার্মান জাতিকে আর্য সাম্রাজ্য এবং মুসোলিনী ইটালিয়ানদের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় মাতাল করতে পেরেছিল বলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এত ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। আজকের দিনে যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক বিবেকসম্পন্ন জার্মান কিংবা ইটালীয়ান হিটলার মুসোলিনীকে শুধু উন্মাদ ছাড়া কিছুই মনে করবে না। মানবজাতির লিখিত এবং অলিখিত ইতিহাসের চার ভাগের তিন ভাগ এমনি পাগলামোতে ঠাসা। তাতে করে বিঘ্নিত হয়েছে মানুষের বিকাশ। সুস্থ সক্ষম ব্যক্তিরা সমরক্ষেত্রে নিহত হয়েছে, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়েছে, একপেশেভাবে বেড়েছে বুদ্ধি, বিজ্ঞানীদের সাধনায় এসেছে বাধা, মানবতাবাদীরা নির্যাতিত হয়েছে। যে-কোনো নরহন্তা কলেকৌশলে অথবা ছলে-বলে আপন দলের লোকদের পশুবলে বলীয়ান করতে পেরেছে, তারাই আল্লাহ্ কিংবা ধর্ম, সাম্রাজ্য অথবা স্বদেশ ইত্যাদির নামে প্রতিবেশী দেশের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে। এখন পর্যন্ত এ ঘাতকেরাই বিজয়ী অথবা বীর হিসেবে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। মানুষের উপলব্ধিতে পূর্ণতা যখন আসবে, তখন এ সকল বীরপুরুষেরা ঠ্যাং-ভাঙা টোটেম দেবতার মতো শ্রদ্ধার আসন থেকে ছিটকে পড়বে। অবশ্য ইতিহাস বিচারের নিরিখটাও তখন পাল্টাবে ।

মানুষের ইতিহাসের আরো একটি দিক আছে। সে হলো-বিজ্ঞান, শিল্প, কলা এবং দর্শনের দিক। এতে কোনো জাতির সিলমোহর নেই। এক জাতির সুচেতনার সঙ্গে মিশেছে আরেক জাতির নির্মাণবুদ্ধি কলার সঙ্গে দর্শন, এদেশের বিজ্ঞান ও দেশে গিয়ে তরঙ্গ তুলেছে। সামগ্রিকভাবে মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিচিত্র সংক্রমণেই সভ্যতা ষোলকলায় পুষ্টি লাভ করেছে। মৈত্রীভাবনা মানুষে মানুষে সহযোগিতার পথ প্রসারিত করেছে, এক জাতির চিন্তার অভিঘাতে আরেক জাতির কুসংস্কার ঝরাপাতার মতো ঝরে পড়েছে। ভারতে-চীনে, ভারতে-ইরানে, ইরানে-মিশরে, মিশরে-গ্রিসে, গ্রিসে-রোমে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে মনে মনে যে সহযোগিতার ফল তাই আধুনিক বিশ্ববোধ। বুদ্ধির সহযোগিতায় আধুনিক দর্শন এবং বস্তুবিজ্ঞানের সহযোগিতায় আধুনিক বিশ্বদৃষ্টি বিকশিত হয়েছে। আধুনিক জগতের রূপায়ণে আট কি দশজন মৌলিক আবিষ্কারকের দান অসামান্য হলেও বহু দেশের, বহু যুগের চিন্তা, মনন এবং আবিষ্কারের ফসল মন্থন করতে পেরেছেন বলেই তারা মানুষের বাস্তব সিদ্ধিকে আরো এক কি দুধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে সভ্যতার সৌরভ বলতে যা বুঝি আমরা, সে হলো মাত্র গুটিকয় মানুষের মন মগজ খোঁচানো অন্বেষা,জবাব এবং হৃদয়ে হৃদয়ে সহযোগিতার সুফল। অতীতে এ সহযোগিতার পথ বহুলভাবে উন্মুক্ত ছিল না। দেশাভিমান, জাত্যাভিমান, ঐতিহ্যাভিমান, ঐশ্বর্যাভিমান পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি জাতিই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য যখনই অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, অপরকে দাসে পরিণত করে তার শ্রম, অর্থ, ফসল আত্মসাৎ করা ছাড়া আর কোনো মহত্তর পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে পারেনি। মজার কথা হলো, অপরকে ক্রীতদাস বানিয়ে, তাকে পশুর মতো

খাঁটিয়ে, তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে দেবতার বিজয় ঘোষণা করেছে। কিন্তু অবাধে মানুষের সৃষ্টিশীলতা, জাতির সঙ্গে জাতির যদি মেশামেশি হতো অতীতে, তাহলে এতদিনে পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যের অনেকগুলো গ্রহে হয়তো উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেই ফেলত।

বিগত যুগে মানুষ যা উপলব্ধি করতে পারেনি, এ যুগে মানুষের তা হৃদয়ঙ্গম করার সময় এসে গেছে। কেননা মানুষের সৃষ্টিশীলতা এবং পাশবিক প্রবৃত্তি এখন পরস্পরের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বীর বেশে দণ্ডায়মান। মানুষকেই পছন্দ করতে হবে দুটির একটি। হয়তো সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে সকল মানুষকে, পৃথিবীর মাটিতে দিতে হবে অধিকার। উন্নত জাতিসমূহ অনুন্নত জাতিগুলোকে তাদের বাস্তবসিদ্ধি এবং মননের সমৃদ্ধির অংশীদার করে তুলতে হবে। এ না হলে দেশ, ধর্ম, নীতি, দর্শন, সম্প্রদায় ইত্যাদি কতক গালভরা সুন্দর শব্দের অন্তরাল থেকে পাশবিক প্রবৃত্তি আপনাআপনি প্রকটিত হয়ে পড়বে। তা যদি হয়, সহজেই ধরে নেয়া যায়, পৃথিবীতে মানুষের দিন ফুরিয়ে এল। পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রগুলোও ধীরে ধীরে এ সত্য উপলব্ধি করছে। এক জাতি ও এক বিশ্বের চেতনা দেশে দেশে আলোড়নের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। শুভবুদ্ধি এবং কল্যাণচেতনার নিরিখে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উত্তাপ প্রশমিত করা সম্ভব, কিন্তু বর্তমানেও পৃথিবীর জাতিসমূহের চালিকাশক্তির পেছনে যতটুকু রয়েছে কুসংস্কার ততটুকু সুচেতনা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতি অনুন্নত জাতির সম্পদ লুট করছে, বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য অটুট রাখার জন্য সামরিক ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা করছে এক শিবির, আরেক শিবিরও পাল্টা সামরিক জোট গঠন করছে আক্রমণ

প্রতিহত করার জন্য। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলো আপনাপন দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে সকল রকমের সুযোগ হতে বঞ্চিত করছে। এ বঞ্চিতদের দল জেগে ওঠে যদি কোনোদিন সিংহাসন ধরে হেঁচকা টান দেয়, এ ভয়ে সবসময় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে জিইয়ে রেখেছে। যখনই দেশে তেমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী শত্রুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ধর্মপ্রেম ইত্যাদির নামে পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন এ সবের মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিজাতি বিদেশীর বিরুদ্ধে, প্রচার অভিযান চালিয়ে জনসাধারণের মন এমনভাবে বিষিয়ে দেয় যে, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার কথা বলে যারা, তাদেরকে অতি সহজে দেশদ্রোহী জাতিদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করতে ক্ষমতাসীন দলের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। জনসাধারণের সংগঠিত কুসংস্কারই রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুসংস্কারের সঙ্গে আপোস করে যারা ক্ষমতা দখল করে, তারা সমগ্র জাতিকে নরহত্যার প্রচণ্ড উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখে। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই কোনো। ফলে জাতিতে জাতিতে বৈরীতার রূপ তীব্র হয়ে উঠছে। বিশ্বে বিষফেঁড়ার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য যারা কায়েম রাখতে চায়, এসকল বিষফোঁড়া রগড়ে রগড়ে ক্ষতকে আরো দগদগে করে তুলছে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে সভ্যতাকে শুধু মুষ্টিমেয় শহরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, মানুষকে যন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত রেখে যন্ত্রের দাস করেছে। স্তরের পর স্তর কুসংস্কার, তার উপর রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রনায়কেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্তিহীন কুসংস্কারকেই লালন করেন অথবা করতে বাধ্য হন। এ অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে প্রতিহত করার সকল রকম উপায় ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হবে।

অথচ মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য এ যুদ্ধকে অবশ্যই রুখতে হবে নয় শুধু, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করতে হবে। এককভাবে কোনো জাতির শান্তি প্রচেষ্টাতে আসবে না কোনো সুফল। সমস্ত জাতি মিলে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে, সেজন্য জীবনবিনাশী সকল রকমের সংস্কার এবং বিশ্বাস উপড়ে ফেলা একান্তই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উন্নত জাতি এবং অনুন্নত জাতি উভয়েরই সমান দায়িত্ব। সভ্যতা, সংস্কৃতি,কলকারখানা ইত্যাদিকে এমনভাবে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, যাতে করে বিশ্বের প্রতিটি জাতি, এমনকি উপজাতি পর্যন্ত সভ্যতার প্রভায় প্রভাময় হয়ে উঠতে পারে। যন্ত্রকে সব সময়েও মানুষের দাস করে রাখতে হবে এবং সৃষ্টিশীলতাকে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। কারণ শোধিত বিদ্বেষই সৃষ্টিশীলতা, উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে সৃষ্টিশীল চেতনাই বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। জাতিতে জাতিতে যে প্রতিহিংসা বিরাজমান, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার অবসান ঘটাতে হবে। মানব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জীবন-ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। তা ছাড়া সামরিক ব্যয়ের বেশির ভাগ অর্থ জনকল্যাণের জন্য ব্যয় এবং একাংশ মহাশূন্য অভিযান তহবিল, মেরু অভিযান, মরু অভিযান, সাগর থেকে খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি পরিকল্পনাতে ব্যয় করলে সৃষ্টিশীলতার অভিঘাতে মানুষ নতুন মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠবে। ক্রমাগত সাধনা এবং সিদ্ধি যেমন পশু-মানুষকে কিয়ৎ পরিমাণে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছে, তেমনি নব বিশ্ববোধে উদ্দীপ্ত, নিজেই বস্তুচেতনার অধিকারী মানুষ বিচারবুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারবে এবং যুদ্ধ করার প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তিও ধীরে ধীরে ভুলে যাবে।

এ হয়তো কঠিন,খুবই কঠিন কাজ। কুসংস্কারের সঙ্গে আপোসকারী, রাষ্ট্রযন্ত্রের দণ্ডধর, দলীয় এবং শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ রাষ্ট্রনায়কদের খণ্ডিত উপলব্ধি এবং লোভের কারণে পারমাণবিক বোমার আঘাতে নিহত হওয়ার চাইতে কঠিন নয় নিশ্চয়ই। ধর্ম, স্বর্গ, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদির ফসিল বিশ্বাস এবং জীবন্ত বিশ্বাসকে শল্যচিকিৎসকের মতো অস্ত্রোপচার করে চেতনা থেকে হেঁটে ফেলতে পারলেই মানবিক কল্পনা ঈর্ষার বদলে সৃষ্টিশীলতার দিকে আপনিই ধাবিত হবে।

ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সৃষ্টিশীলতার উপরই বিশ্বাস রাখতে হবে। সৃষ্টিশীলতাই মুক্তির দিশারী ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র

বাংলা সাহিত্যে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির কোনো জুড়ি নেই। এই উপন্যাসের একটি চরিত্রে মানিকবাবু যে সুগভীর ইতিহাসবোধ, জীবন অভীপ্সা এবং মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, বোধকরি চরিত্রসৃজনকুশলতায় তারো কোনো জুড়ি নেই। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির কথা উঠলেই কুবের, মালা, কপিলা, রাসু, গনেশ ইত্যাকার মানুষদের মুখগুলো আপনা-আপনিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মানিক বাবু তেমন শিল্পী (বিশেষ করে 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে) যা স্পর্শ করেছেন, জীবন্ত করে তুলেছেন। ক্ষিপ্র টানে একেকটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পদ্মা নদীর মাঝি'র প্রমত্তা পদ্মা থেকে শুরু করে, প্রাকৃতিক তাণ্ডব, ঝড়, বন্যা, সমুদ্রের ভয়ংকর বিস্তার, এমনকি সে আকুরঠাকুরের গ্রামের শ্যামাদাসের বাড়ির গম্ভীর পাঁঠাটি পর্যন্ত আশ্চর্য রকম জীবন্ত। যে নৈসর্গিক পটভূমিকায় জীবন সংগ্রামে কাতর মানুষগুলোকে তিনি স্থাপন করেছেন সেই নিসর্গ যেমন ভীষণে সুন্দরে জীবন্ত, তেমনি জীবন্ত বিচিত্র আবেগের মানুষগুলো। কেউ বাড়তি নয়, কোনো ঘটনা বাহুল্য নয়, কোনো দৃশ্যপট অতিরিক্ত নয়। তাই উপন্যাসটির কথা উঠলেই সবকিছু মনে পড়ে যায় এবং সব মিলিয়েই উপন্যাসটি। যার যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকু আয়তনের মধ্যেই লাগসইভাবে বসে গেছে। কুবের-মালা-কপিলা-রাসু এসব চরিত্রের ক্রমিক উন্মোচনের মধ্যে যে হৃদয় ভাবনার উৎসার হয়েছে, গভীর চিন্তাটি পর্যন্ত পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে উপস্থাপনার বাস্তবতা এবং শিল্প সৌকর্য নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব।

উপস্থিত মুহূর্তে আমরা তার 'হোসেন মিয়া' চরিত্রটির প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকাবার চেষ্টা করছি। বেবাক বাংলা সাহিত্যে এমন আশ্চর্য চরিত্র আর কোনো শিল্পী সৃষ্টি করেছেন কিনা সন্দেহ। শুধু অন্তদৃষ্টি, শুধু জীবনবোধ কিংবা লেখকসুলভ নির্লিপ্ততা, লেখার রাজনৈতিক সামাজিক দর্শন অথবা মানবচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই এরকম একটা চরিত্র সৃষ্টি করা যায় না। আরো অধিক কিছুর প্রয়োজন।

সমস্ত উপন্যাসে যদিও 'হোসেন মিয়া'র উপস্থিতি অধিক নয়, তবু 'হোসেন মিয়া'ই উপন্যাসটির প্রাণ। কিন্তু তাই বলে 'হোসেন' উপন্যাসটির নায়ক নয়। নায়কের যে আবেগ থাকে, দুর্বলতা থাকে, 'হোসেনে'র চরিত্রে তার ছিটেফোঁটাও নেই। ইলিয়াড মহাকাব্যে দেবরাজ জিউসের নির্দেশে যেমন সবকিছু একের পর এক ঘটে যাচ্ছে- বিজয়ী-বিজিত, হত এবং হন্তা শুধু নিমিত্তমাত্র, সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই মহাইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন দেবতার চূড়ান্ত ইচ্ছারই বিজয় সূচিত হয়েছে; 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে পাদপ্রদীপের একটু পেছনে দণ্ডায়মান মিঠেমিঠে বুলি এবং গুছিগুছি দাড়িবিশিষ্ট এই শান্ত একেবারে অনুত্তেজিত মানুষটিও সেরকম শক্তির অধিকারী। তার প্রকাণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রবল বাধ্যবাধকতা পদ্মার তীরবর্তী জেলে সমাজে অত্যন্ত সক্রিয়, তারা কেউ সে নিগড় ছিন্ন করতে পারে না। এই মহাস্বাপ্নিকের স্বপ্ন সফল করার জন্য আনন্দবেদনা স্পন্দিত প্রেম ভালোবাসা কল্লোলিত অন্তর নিয়েই স্বেচ্ছায় 'হোসেন মিয়া'র কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। অথবা তাদের বেঁচে থাকবার গভীর আকাঙ্ক্ষাই তাদেরকে বাধ্য করে হোসেন মিয়ার কাছে যেতে। পদ্মা পারের এই এক টুকরো পৃথিবী, যেখানে জেলে

সমাজের বসবাস, মায়ামমতা, ঝগড়াবিবাদ এবং প্রাণধারণের সমূহ আর্তি গভীর করুণ সুরে বেজে ওঠে, তা যখন কোনো কারণে দৃষ্টির সীমানা থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়, বিশাল পৃথিবীর অন্য কোনো স্থান, অন্য কোনো জনপদ তাদের দৃষ্টিতে নিবাসভূমি হিসেবে ভেসে ওঠে না; জঙ্গলাকীর্ণ, বাঘ সিংহে ভরা, লোনাজলবেষ্টিত ঊষর অনুর্বর ময়নাদ্বীপের ছবিই চোখে চোখে দৃশ্যমান হয়। সেখানে যাবার দুঃস্বপ্ন তাদের পেয়ে বসে এবং শেষ পর্যন্ত যেতেও হয়। হোসেন মিয়া এই ময়নাদ্বীপের রাজা এবং আবিষ্কারক দুই-ই।

'হোসেন মিয়া'র পরিচয় এভাবে দিয়েছেন লেখক তার বাড়ি ছিল নোয়াখালী অঞ্চলে। বেশ কয়েক বছর আগে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামে সে আসে এবং সে সময়ে জহুর মাঝির বাড়িতে আশ্রিত হিসেবেই ছিল ও অন্যান্য মাঝিদের সঙ্গে মাঝিগিরি করেই জীবিকা নির্বাহ করত। এ কয় বছরে সে বেজায় রকম ধনী হয়ে উঠেছে। এখন দাড়িতে মেহেদির রং লাগায়, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি শরীরে চড়ায়, মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই দুনম্বরের স্ত্রীকে বিয়ে করে এনেছে। ধনী হওয়া সত্ত্বেও সে জেলে পাড়ার লোকদের সঙ্গে আগের মতোই মেলামেশা করে। ধনসম্পদ হাতে এলে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্মত্ত মোহ মানুষকে পেয়ে বসে, 'হোসেন মিয়া'র মধ্যে তার কণামাত্রও নেই। বড়লোকের সঙ্গে সে ব্যবসা করে, সমাজ করে না। আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন লেখক, হোসেন মিয়া একজন স্বভাব কবি। ঘটনাচক্রে যদি হোসেনের জীবনধারা বদলে না যেত তাহলে অনায়াস কবিত্ব শক্তির বলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একজন সাধুপুরুষ হিসেবে পরিচিত হতে পারত। 'লালন শাহ', হাসান রাজার মতো তারও অনেকগুলো রচনা পল্লিগ্রামের গীতি সংগ্রহে স্থান করে নিত। আশপাশের দশগ্রামের মানুষ জাগতিক

কল্যাণাকাতক্ষায় তার কবরে ভক্তিভরে মোমের প্রদীপ জ্বালাতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে 'হোসেন'কে অন্য জীবন বেছে নিতে হয়েছে, তাই বলে তার কবিত্ব শক্তির উৎস একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। এখনো সে ইচ্ছে করলে মুখে মুখে চমৎকার গান রচনা করতে পারে। তার আত্মপ্রত্যয়ের জুড়ি নেই। তাই 'হোসেন' যখন বলে, খুশি হলে সে সব করতে পারে, একটুও অস্বাভাবিক শোনায় না। অপরিসীম আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন, নানাগুণে গুণান্বিত 'হোসেন মিয়া'র আত্মসংযমেরও তুলনা নেই। কেউ তার ক্ষতি করলে শাস্তি সে দেয়, কিন্তু কখনো কোনো ব্যাপারে তাকে রাগ করতে দেখা যায়নি।

'হোসেন মিয়া' পাকা মাঝিও বটে। এত নির্ভাবনায় সে গভীর সমুদ্রে নৌকায় হাল ধরে বসে থাকতে পারে, পদ্মাপারের বংশ পরম্পরা মাঝিরাও 'হোসেনে'র হেকমত দেখে চমকে যায়। সে ম্যাপ দেখে দ্বীপের অবস্থান নির্ণয় করতে জানে, রাতের তারার গতিপথ দেখে সময় কত বলতে পারে, দিক নির্ণয়ের কাজে চুম্বক ব্যবহার করতে জানে নির্ভুলভাবে। চাটগায়ে সায়েব কোম্পানির জাহাজে চাকরি করার সময় যন্ত্রপাতি চালনার বিদ্যা এত গভীর অনুরাগ নিয়ে শিক্ষা করেছে যে, ইচ্ছা করলে 'হোসেন' একখানি জাহাজ নিয়ে সমস্ত পৃথিবী একাকীই ঘুরে আসতে পারে।

'হোসেন মিয়া'র বাড়ি নোয়াখালী। মাঝখানে অনেক বছর জাহাজে সে চাকরি করেছে এবং বর্তমানে পদ্মাপারের কেতুপুর গ্রামের হিন্দু-মুসলমান মাঝিদের সঙ্গেই তার সমাজ।

সংকীর্ণ পৃথিবীর এই অধিবাসীরা অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন 'হোসেন মিয়া'র সাথে ঠিক মিশতে পারে না। কিন্তু তাদেরকে তার কাছে যেতেই হয়। 'হোসেন' যদিও বলুক-না কেন সে হৃদয়ের মধ্যিখান থেকে তাদের পেয়ার করে, তথাপি মজ্জাগত আদিম অসহায়তার ভীতি তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না। যন্ত্রের মতো নিখুঁত, দেবতার মতো পারঙ্গম এবং জীন-পরীর মতো রহস্যময় 'হোসেন মিয়া'র কথায় সায় দিলে, তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে যে একদিন অমঙ্গল এসে তাড়া করবে তারা বুঝতে পারে। কিন্তু তাদের নিয়তিই এমন যে তারা যেন 'হোসেনে'র কথায় সায় দিতে এবং তার নির্দেশ পালন করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে।

বহিরঙ্গের দিক দিয়ে দেখলে 'হোসেন নোয়াখালী জেলার মুন্সী মোল্লা জাতীয় মুসলমান। সে মুন্সী মোল্লার মতো কথা বলে, পোশাক পরে, দাড়ি রাখে, আবার দাড়িতে নুরে মেহেদির রংও লাগায়। এ হলো বাইরের ব্যাপার। ভেতরের মানুষটি ঠিক একবারে অন্যরকম। হোসেনের মধ্যে ধর্মীয় কোনো সংস্কারের সামান্য আঁচারও নেই। এ নিয়ে সে কোনো কথাই বলে না। সে শুধু বোঝে তার জন্য কোটা সুবিধার । জগৎ এবং জীবনকে সে যে দৃষ্টিতে দেখে তার সঙ্গে অন্য দশজন প্রাচ্য দেশীয় মানুষের কোনো মিল নেই।

আজিজ সাহেব প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদি ময়নাদ্বীপে মসজিদ স্থাপন করে এবং হিন্দুদের জমি দেয়া বন্ধ করে তাহলে বসবাসকারী সংগ্রহের কিছুই অসুবিধা হবে না। হোসেন সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। গ্রহণ না করার পেছনে কারণ হলো, মুসলমানদের জন্য যদি মসজিদ বানিয়ে দেয়, তা হলে হিন্দুদের জন্যও মন্দির বানিয়ে দিতে হবে। আর

হিন্দুদের যদি সে না নিয়ে যায়, তাহলে এগার মাইল দীর্ঘ এই দ্বীপ সে কিভাবে মানুষ দিয়ে পূরণ করবে তাই হোসেনের যুক্তি হলো, মন্দির মসজিদ সব ফ্যাসাদে গিয়ে কাজ নেই। ওসব ছাড়াই চলবে ময়নাদ্বীপ। ময়নাদ্বীপ আবাদ করে বসবাস স্থাপন করার সঙ্গে মন্দির মসজিদের কোনো ব্যবহারিক সম্পর্ক নেই। তাই পরম নিশ্চিন্তে সেগুলো বাদ দিতে পারে । ময়নাদ্বীপে সে যে নতুন মানব সমাজ সৃষ্টি করতে চায় তারা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হবে, হবে নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান, নতুন মূল্য চেতনায় সমৃদ্ধ হবে তাদের অন্তর্লোক। অতিকষ্টে যে সকল ভাঙাচোরা মানুষকে 'হেসেন' সংগ্রহ করে, পাত্রী ঠিক করে তাদের বিয়ে দেয়, তাদের প্রতিও 'হোসেনে'র কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু এই নরনারীর মিলনে যে মানুষ মানুষী আসবে এবং ময়নাদ্বীপে বসবাস করবে তাদের প্রতিই রয়েছে তার প্রকৃত আগ্রহ। যেন 'হোসেন' নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন মানব সভ্যতার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে একাকী। এই রকম একটি প্রকাণ্ড ঘটনা যার প্রয়াসের মধ্য থেকে সম্ভাবিত হয়, তাকে বিধাতা পুরুষের মতো পারঙ্গম,দুর্জ্জেয় এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে হয়। স্বয়ং বিধাতাপুরুষও নাকি একজন কবি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার কবিতা। মানিক বাবুর 'হোসেন মিয়া'ও একজন ক্ষুদে বিধাতাপুরুষ। সীমিত পরিসরের মধ্যে তার অসাধ্য কোনো কিছুই নেই এবং ময়নাদ্বীপ তার একটি কবিতা। একজন ভাবমুগ্ধ কবি যেমন সমস্ত প্রযত্ন প্রয়াস বিলিয়ে দিয়ে কবিতাটিকে সার্থক করে তুলতে চান, 'হোসেন মিয়া'ও স্বপ্নের শেষ বিন্দুটি দিয়ে ময়নাদ্বীপকে, লোক কোলাহলে মুখরিত একটি কাব্যিক ভূখণ্ড হিসেবে নির্মাণ করতে চায়।

যৌনাচারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও 'হোসেনের মতামত রীতিমতো কৌতূহলের সঞ্চার করে। বৃদ্ধ বসিরের স্ত্রীর সঙ্গে যুবক এনায়েতের সম্পর্ক নিয়ে ময়নাদ্বীপের ক্ষুদ্র জনসমাজটির জনমত চঞ্চল হয়ে উঠলে লোক দেখানোর জন্য 'হোসেন' এনায়েতকে তিনদিন অভুক্ত বেঁধে রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাতে বসিরের স্ত্রীকে যখন এনায়েতকে স্বহস্তে ভাত খাইয়ে দিতে দেখা যায় সে খবর গোপন রাখার জন্য 'হোসেন' অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করে। 'হোসেনের ঐ একই যুক্তি, বৃদ্ধ বসিরের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। অথচ তার স্ত্রীর সঙ্গে যুবক এনায়েতের সম্পর্ক নিয়ে দ্বীপবাসীদের মধ্যে কথা উঠলে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করে। কিন্তু রাতে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এনায়েতের সঙ্গে বসিরের স্ত্রীর মিলনের বন্দোবস্ত করে দেয়। তার ফলে একটি নতুন মানুষ জন্ম নিতে পারে। 'হোসেন মিয়া'র চোখে একেকটি নতুন মানুষ হীরা মাণিক্যের চাইতেও মূল্যবান।

.

২.

'হোসেন মিয়া'র চরিত্র বিশ্লেষণ করলে কতিপয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। যদিও সে গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, মুন্সি মোল্লাদের মতো জামা কাপড় পরে, তথাকথিত সমাজের প্রতিষ্ঠাবানদের এড়িয়ে চলে তথাপি 'হোসেন মিয়া বিশ্বাস, হৃদয়বৃত্তিতে এবং কল্পনায় একেবারে খাঁটি আধুনিক মানুষ। যন্ত্রবিজ্ঞানে

তার বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতিও যে নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ, সে নিয়মগুলো আয়ত্ত করতে পারলে প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ থাকে না। প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানই 'হোসেন মিয়াকে অকুল সমুদ্রের বুকে এমন অনুত্তেজিত, সাহসী এবং প্রত্যয়সম্পন্ন করেছে। আসলে জ্ঞানই যে শক্তি তা তার টুকরোটাকরা বাক্যালাপের মধ্যে বিরল হীরার দ্যুতির মতো ঝরে পড়েছে। যে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসাদে এবং প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানের সাহায্যে একসময়ে ইউরোপীয় ভৌগোলিক অভিযাত্রীর দল আমেরিকা থেকে মেরু প্রদেশ অবধি অভিসার যাত্রা করেছিল, 'হোসেন মিয়া' সে কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুকেরই বঙ্গীয় সংস্করণ । অতি চেনা পোশাকে কোনোরকম ভণিতা ছাড়াই দেখা দিয়েছে বলে ঠিক সেরকম মনে হয় না । মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রেও 'হোসেন মিয়া পুরনো চেতনার স্থলে নতুন মূল্য চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ধর্ম 'হোসেন মিয়া'র দৃষ্টিতে একেবারে অপ্রয়োজনীয় এবং পুরনো পৃথিবীর স্মারক চিহ্ন। তাই তার নতুন উপনিবেশে নিজের কিংবা অপরের কোনো ধর্মকেই শেকড় প্রসার করতে না দিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ নিয়ে সে বিশেষ বাক্যালাপ করে না। কারণ সমতল ভূমির লোকেরা তার এই চূড়ান্ত মতামত সমূহকে কখনো যথার্থ বলে মেনে নেবে না। একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। তাতে করে তার স্বপ্নের অপমৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে । এত বুদ্ধিমান, এত দক্ষ 'হোসেন মিয়া'ও জানে ডাঙার মানুষগুলোর আচার সংস্কারের বেড়াজালে আটকা পড়লে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। তাই 'হোসেন মিয়া অজস্র অর্থের মালিক হয়েও কখনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে পা বাড়ায়নি। ইচ্ছা করলে সে সামাজিক সুনাম সুখ্যাতি কিনে নিতে পারত। কিন্তু তা করতে গিয়ে হোসেনকে

আটকা পড়ে থাকতে হতো এবং অচরিতার্থ থেকে যেত কবি 'হোসেনে'র একটি নির্জন দ্বীপে একটি নতুন উপনিবেশ, একটি নতুন সভ্যতার একক স্রষ্টা হওয়ার স্বপ্ন।

সামাজিক এবং নরনারীর সম্পর্ক-বিষয়ক যে মতামত 'হোসেন' পোষণ করে তাতে বেঁচে থাকার বাস্তব দাবির প্রতিই পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। ভুল করেও তার মুখ দিয়ে একবার, বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না,কল্পনা দিয়ে ধরা যায় না এমন কোনো ভৌতিক বিষয় উচ্চারিত হয়নি। কি সমাজ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, কি নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, হোসেন মিয়ার যে মতামত তা পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত করলে সেগুলো যে চেহারা পাবে তা দাঁড়াবে অনেকটা ইউরোপীয় প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতামতের অনুরূপ।

.

৩.

আসলে 'হোসেন মিয়া' চরিত্রটিকে লেখক মানিকবাবু মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অনেকগুলো পর্যায়েরই ঘনীভূত রূপ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যন্ত্রবিজ্ঞানে মানুষের দীক্ষা, ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযাত্রা এবং সামাজিক মানব সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত সন্তর্পণে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে 'হোসেন মিয়ার' চরিত্রে চরিয়ে দিয়েছেন। এই তিনটি জিনিসই ইউরোপে 'এনলাইটেন্টমেন্ট' আন্দোলনের ফল। কোনো বাঙালির মধ্যে এই তিনটি বিষয় সচরাচর

সমান পরিমাণে মিলমিশ খায় না। প্রায় তিন শতাধিক বছরের অর্জিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন একটি ভৌগোলিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাণবান করে তোলা প্রায় অসম্ভব। জীবনে যা অসম্ভব, মানিকবাবু শিল্পে তা সম্ভব করে তুলেছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'হোসেন মিয়াকে বলতে হয় নব্য মেঘনাদ'। একটি মাত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানব জাতির অগ্রসর অংশের চিন্তা চেতনা, জীবন অভীপ্সা। দৃশ্যমান করে তোলার জন্য ভূগোল-ইতিহাসের কি পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা অবাক বিস্ময়ে কল্পনা করার বিষয়। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রতিভূ হিসেবে 'হোসেন'কে উপস্থাপন করেছেন বলেই সমস্ত উপন্যাসে 'হোসেনের মনোবৃত্তিসমূহের কোনো বিকাশ নেই, রূপান্তর নেই- আগাগোড়া একরকম। রক্ত মাংসের মানুষ হলেও কোনো মানবিক অনুভূতি তার মধ্যে নেই।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সমালোচকেরা 'হোসেন মিয়া'র চরিত্রের যে একটা ঐতিহাসিক দূর বিস্তৃতি রয়েছে বলতে গেলে তার মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থই হয়েছেন। কাউকে এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত করতে দেখা যায়নি। যতটা চেনা পোশাকে দেখা দিক না কেন 'হোসেন মিয়া' চরিত্রের কোনো বাস্তবতা নেই। এ সম্পূর্ণভাবেই লেখকের মায়া সৃষ্টি। এই 'হোসেন'কে জামা কাপড় পাল্টে ভিন্ন পরিবেশে অনায়াসে সায়েন্স ফিকশনের নায়ক করে দেয়া খুবই সহজ। পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে জীবন্ত নরনারী এবং সজীব প্রাণবান প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তরালে অবাস্তবতাটুকু ঢাকা পড়েছে। সর্বোপরি মানিক বাবুর অসাধারণ শিল্প প্রতিভা 'হোসেন মিয়াকে একান্ত বাস্তবানুগভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনা

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-সাধনার প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে ক্রমশ মনে এ বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দূরের মানুষ। তাকে ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই মনে করলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ধরাছোঁয়ার অতীতই থেকে যান এবং একই কারণে দুর্বোধ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সাধনা, নিষ্ঠা, শ্রম এবং সর্বোপরি সময়ের প্রয়োজন অপরিহার্য।

রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় কড়া আলো কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সমধর্মী সূক্ষ্ম, মিহি, সর্বব্যাপ্ত ও সর্বভুক এক ধরনের চেতনায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক অবদান। তিনি যে যুগের চৌহদ্দীতে লালিত পালিত সংবর্ধিত তার আগের কিংবা পরের যুগের বাংলা সাহিত্যে জীবনের শ্রেয়োবোধর সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনার এমন সুনিবিড় মিলন কোথাও ঘটেনি। এ অসম্ভব একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাধনাতেই সম্ভব হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান গুণ। আবার প্রকারান্তরে দুর্বলতাও বটে। এই শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সৌন্দর্য চেতনার সহজ স্বাভাবিক মিলন রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তা তাকে দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বলোকের সর্বযুগের, সর্বদেশের আপনার জন করে তুলেছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে শিল্পের এই অতি গভীর প্রতীতি, অতি প্রসারিত জীবন-দৃষ্টি তার শিল্পকর্মের অনন্যতা কতকাংশে খর্ব করেছে। জীবনের সরু, মোটা, বঙ্কিম তীর্যক অনেকগুলো স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রমানস

মথিত করেনি, সেজন্যে তার মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে অনেকটা ঋতু বৈচিত্রের মতো স্বাভাবিক নিয়মে। দুয়েকটা বিস্ফোরণ ছাড়া রবীন্দ্রমানসে কোনো বিপ্লব কিংবা ব্যাপক পরিবর্তন নেই। উদ্ভিদের সহনশীলতায় তিনি ক্রমাগত আলোর পানে এগিয়ে গেছেন। নদীর একনিষ্ঠ স্রোতের মতো একটি স্থির লক্ষ্যের পানে আমৃত্যু ধেয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথের চেতনা।

এ অন্তঃসলিলা ধারাস্রোতের সঙ্গে আরো নানা ধারার মিলন এর গতিতে দিয়েছে বেগ, কখনো বা এসেছে বন্যা। জল কূল ছাপিয়ে গেছে। প্লাবিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ। বিশ্বেও লেগেছে দোলা। কিন্তু মৌল ধারাটি কোথাও রুদ্ধ কিংবা ব্যাহত হয়নি। এমনকি জীবনের অন্তিম ক্ষণেও সূর্যের প্রলম্বিত রশ্মি ছটার মতো সুন্দরভাবে অন্তরের সত্য বোধটি কবিতার আকারে তার মুখ থেকে একটি আলো লাগা শিশির বিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে।

আজীবন সুন্দরের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দুর্মর প্রচেষ্টারই তো নাম রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তার ঐকান্তিকতা ধর্ম প্রচারকের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। অত্যন্ত সুকুমার সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, শ্রদ্ধার ভারে আনত একখানা মন নিয়ে তিনি যেন প্রচারকের ভূমিকায় নেমেছিলেন। কিন্তু প্রচারকের লেবাস তিনি কখনো অঙ্গে ধারণ করেননি। হৃদয়ের সত্যোপলব্ধি প্রকাশের জন্য কবিতা লিখেছেন। কবিতা লিখে তার মনে হয়েছে যা বলতে চেয়েছেন, কিছুই বলা হয়নি। গল্প লিখেছেন তাই। তার পরেও মনে হয়েছে কালির অক্ষরে প্রাণের সুবর্ণ তরঙ্গমালা যেমনভাবে উচিত তেমনভাবে বেঁধে

রাখতে পারেননি। তারপরে লিখেছেন নাটক, হয়তো প্রবন্ধ। এতগুলো মাধ্যমে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার পরেও তৃপ্তি আসেনি। শরণ নিতে হয়েছে সঙ্গীতের। দ্রাক্ষাকুঞ্জের মর্মরিত বিবাগী হাওয়ায় সমস্ত অন্ত র-প্রাণ মেলে ধরেও মনে হয়েছে অস্তিত্বের গোপন গহন অন্তঃপুরে আরো সৃষ্টির বীজ বুঝি রয়ে গেল। অস্তিত্বের গভীরে যেখানে চাপ-চাপ আঁধারের নিশুতি, যেখানে মানুষ নিজের অজান্তে আদিমতার ছাপ বয়ে বেড়ায়, সেখানেও পৌঁছেছে সৌন্দর্যের 'গন্ধহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসের' আহ্বান। সত্যের শুভ্রস্বরূপ তায়িত জলের মতো চেতনার গভীর স্তরকেও করেছে রঞ্জিত। সেজন্য তিনি শুধু অলঙ্কার আর আলোর প্রতিমা নির্মাণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। রং, রেখা আর তুলির সাহায্যে আপন হৃদয়ের প্রতিরূপ নির্মাণের জন্য তাকে আসতে হয়েছিল চিত্রকলার বর্ণিল জগতে।

অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের শিখা এবং সবল কাণ্ডজ্ঞানের অঙ্কুর তার মধ্যে অতি শৈশবে জেগেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটি বোধ ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠ হয়ে সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো মিশে গেছে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মে মহর্ষির আত্যন্তিক অনুরক্তির কথা স্মরণ না রেখে রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা করলে তা একপেশে হতে বাধ্য।

কবির অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: হে ধ্রুব সত্য সনাতন! কাল সহকারে কত বিষয়ের কত প্রকারে পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার কারুণ্য স্বরূপের কদাচ পরিবর্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষের অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িতসমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার কারুণ্যস্বরূপের কোনো পরিবর্তন নাই।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথেরা প্রার্থনায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। কবি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কঠোর এই উপাসনার মন্ত্রকেই দৈনন্দিন জীবনচর্চার একমাত্র নিয়ামক হিসেবে কঠিন আত্মবিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন। ফার্সী সাহিত্যের রসিক পাঠক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মকে বেদ কিংবা বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিফল হয়ে মানুষের 'হৃদয় মন্দিরে' প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করার উপযোগী নির্ভার করার জন্য তার ত্যাগ তিতিক্ষা তাকে পরবর্তী সময়ে মহর্ষিতে রূপান্তরিত করেছিল।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপর তার পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব এত ব্যাপক, এত সুগভীর যে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠকের মনে হবে গীতাঞ্জলী, নৈবেদ্য, গীতিমাল্য, গীতালী ইত্যাদি আত্মনিবেদনমূলক কাব্যগুচ্ছ তার পিতার মুখের কথাই শুধু ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেছেন। তার অনেকগুলো গানের বেলাতেও এই একই কথা খাটে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রায় রচনাতেই সৌন্দর্যের বসনে ভূষিত সত্যবোধের যে কারুণ্য স্বরূপকে

আপন মহিমায় স্থিত দেখি তাও মহর্ষিরই পরমারাধ্য সত্যের প্রতিরূপ যেন। সত্য এবং সৌন্দর্যের এই সম্মিলিত আহিতাগ্নিতে এই যে নিঃশেষে তিলে তিলে আত্মবলিদান এবং তার যে ফল- তা কবিতা হোক, গল্প হোক, নাটক নভেল হোক, পত্র-সাহিত্য হোক, চিত্রকলা হোক, ভাষণ কিংবা ভ্রমণ বৃত্তান্ত অথবা প্রবন্ধ, প্রার্থনা সমালোচনা বাদ প্রতিবাদ যাই হোক না কেন একযোগে সবকিছুকে বলব রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময়ী সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ।

যা কিছু মনের উপর ভারস্বরূপ হয়ে স্বাভাবিক বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, সেই জড়ের উপর প্রাণের বিজয় ঘোষণাই হলো রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনার মূলমন্ত্র। জীবনের ভোগে, উপভোগে নিষ্প্রাণ জড়কে পোষ মানানোই হলো সত্যিকার বীরের চারিত্র্য ধর্ম। মানবিক আশা কম্পিত এবং নৈতিক শ্রেয়োবোধে মণ্ডিত নগ্ন মনুষ্যত্বই প্রকৃত জীবনশিল্পীর অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। কবি শেলী তার রিভোল্ট অফ ইসলাম কাব্যের ভূমিকায় কথাটিকে আরো সহজ, আরো প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন: 'Still love is the only thing which shall guide the moral world of human being.'

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জীবনের আশ্বাসের মতো বিভিন্নভাবে সহস্র ধারায় ঘটেছে এই মানবিক প্রেমের নিঃসরণ। সত্যের স্থির অকম্পিত শিখাকে বুকে ধারণ করেছিলেন যিনি, সৌন্দর্যের স্পর্শমাত্রেই যিনি আন্দোলিত হয়েছেন মানুষের পাপ, লোভ, রিরংসাকে হত্যা করার জন্য অন্তরস্থিত সত্যের পাষাণে–সৌন্দর্যের তলোয়ার শানিয়েছিলেন যিনি, সেই

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে মূল উৎসের থেকে দূরে গিয়ে বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বহু দেশের চিত্তসম্পদ আত্মস্থ করলেও রবীন্দ্রমানসের মর্মমূলে ভারতীয় জীবনবোধই ছিল সব সময়ে জীয়ন্ত। আর্যঋষির চেতনায় তার মানসপট সিঞ্চিত ছিল। সুখী পরিবারের সুস্থ পরিবেশে প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চা তার শিল্পী মনের সমস্ত আয়তন জুড়ে যে অনপনেয় রঙিলা ছাপ ফেলেছিল কোনোদিন তার রঙছুট হয়নি। অতৃপ্ত শিশুর সঞ্চরণশীল চেতনায় প্রাচীন ঋষির বাণী ঋষিপ্রতিম পিতৃদেবের মৌন সংযত স্নেহঘন ছোঁয়ার শিহরন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের শিখা এবং সবল কাণ্ডজ্ঞানের অঙ্কুর জাগিয়ে তুলেছিল। রবীন্দ্র মানসের যে কঠিন ফ্রেম যার উপর প্রবল একটি আলোকিত ঝরনার মতো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিচেতনা সমুজ্জ্বল বিশ্বাসে আমৃত্যু উড্ডীন ছিল, ঠাকুর বাড়ির কারখানাতেই তার সৃষ্টি এবং দেবেন্দ্রনাথ তার যাদুকর কারিগর।

নিঃসঙ্গ বালকের মনে অনন্তের তৃষ্ণার বীজরূপী উপনিষদের বোধ কোমল চিত্তবৃত্তির সঙ্গে তরল সঞ্জীবনী সুধার মতো মিশে গিয়েছে। অস্তিত্বের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া সুপ্রাচীন ফসিলীভূত প্রাণের ললিতবাণী সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো অনেক কিছুর।

আপন পরিবারেই তিনি ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বেদ উপনিষদ, গীতার সারসত্য যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে হাফিজ, খৈয়াম প্রমুখ

ইরানী সাধকের সাধনার রাঙা স্রোতের ধারাও শৈশবে রঞ্জিত করেছে তার চিত্ততল। প্রাচীন ভারতের মহিমামণ্ডিত প্রতিভা বাল্মীকি, কালিদাস, বেদব্যাস,ভবভূতির সংস্কৃত কাব্য তিনি আগ্রহ সহকারে পড়েননি শুধু বিধৃত কাব্য চিত্রাবলীও বালকের সচঞ্চল অনুভূতি দিয়ে আপনার করে নিয়েছিলেন। হাজার বছরের তমসা বিদীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা প্রাচীন ভারতের দেবদেউল, তুষার মণ্ডিত শৈলশিখর, বেত্রবতী, শিপ্রা, শ্রাবন্তী, উজ্জয়িনী, প্রশান্ত পোবন, সুকুমার ঋষিকুমার, নিবিড় অরণ্যানী মহানুভব রাজন্যবর্গ সকলকে চিনে নিয়েছিল। সে যে কত গভীর চেনা, কত নিবিড় আত্মীয়তা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক তার মর্মোপলব্ধি করতে পারবেন।

শুধু সংস্কৃত কেন প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহের স্পন্দন তার চেতনায় এক অপরূপভাবে তরঙ্গিত হয়েছে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে মেলে তার কিঞ্চিত পরিচয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতে রামমোহন মনীষার আশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের যে নব অঙ্কুরোদগম বিদ্যাসাগর, মধুসূধন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রমুখ সাহিত্যসাধকের সঞ্চারিত প্রাণাবেগে যার সমৃদ্ধি একটু একটু করে প্রায় তার সবটুকু মর্মমধু আত্মসাৎ করেছিলেন। সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসকের মতো ভার জীর্ণ অংশ কেটে ফেলে পূর্বসূরি সাহিত্যসাধকের প্রাণকণা সূর্যশিখার উপকরণস্বরূপ সঞ্চয় করেছিলেন।

এতে শেষ নয়, পূর্ব পুরুষের জীবন সগ্রাম, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা নিরূপদ্রব শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে কেঁপে ওঠা প্রাণের রসময় প্রবাহ- যা উত্তর পুরুষের মুখে মুখে বাড়ির পাশের ছোট্ট নদীটির মতো তিরতিরানো ধারায় বয়ে গেছে, সমগ্র বাংলাদেশের সে

লোকায়ত সংস্কৃতিকেও তিনি কোল দিয়েছিলেন, হজম করেছিলেন তার মর্মমঙ্গল লোকায়ত সংস'র মতো তিনি

রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণের ব্যাপকতা, মহাভারতের গাম্ভীর্য, কালিদাসের উপমা, অলংকার, বৈষ্ণব কবির ললিত গানের বাণী, ইরানের রসসিক্ত প্রাণের পেলবতা, লোক সংস্কৃতির সাদামাটা চেতনা, ভারতচন্দ্রের নিপুণতা এবং অগ্রজ কবিদের কোনো কোনো পর্ভূক্তি, কোনো পদ, কোনো শব্দের অবিকৃত অথবা ঈষৎ ভিন্ন প্রয়োগ দেখে বোঝা যায় তিনি স্বদেশের অতীতের মানস ফসল কি গভীর আন্তরিকতায় বুকে তুলে নিয়েছিলেন, কি মমতায় অন্তরের 'সহস্র ব্যগ্র বাহু মেলে' দেশের ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করেছিলেন। য়ুরোপ প্রবাসকালে অল্পবয়স্ক বালক কি প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা। নিয়েই য়ুরোপকে দেখেছিলেন। মনে য়ুরোপ কি তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছিল। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' আমরা এমন একজন তরুণকে দেখি যার দৃষ্টি কড়া আলোকের বন্ধুৎসবের তলায় নিচ্ছিদ্র, নিরন্ধ, ঘনায়মান অন্ধকারকে স্পর্শ করেছে। এমন একটি মনের অনুরণন আমাদের কানে এসে বাজে- যে মন হাসির ফোয়ারার অন্তরালবর্তী কীটদষ্ট মনের ভঁজে ভাঁজে থমকে থাকা করুণ ক্রন্দনের সন্ধান পেয়েছে।

য়ুরোপের অহমিকা তাকে আহত করেছে কিন্তু গরিমাও মুগ্ধ করেছে। শেকসপীয়রের মানবোপলব্ধি, মিল্টনের কল্পসাঁতার, শেলীর মুক্ত প্রমিথিউস, বায়রনের উদ্দামতা, কীটসের তন্ময়তা, ব্রাউনিঙের অধ্যাত্মোপলব্ধি, গ্যয়টের মানবীয়তা, রাসকিনের প্রগাঢ়তা, টলস্টয়ের ব্যাপ্তি এবং ফরাসী সাহিত্যিকদের বাগবৈদগ্ধ তাকে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ

করেছে। তাছাড়া আরো নানা প্রাণের স্পর্শ প্রাণে এসে অবশ্যই লেগেছে। তবে তিনি য়ুরোপের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেই সহমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি।

রেনেসাঁ প্রভাবিত পশ্চিম য়ুরোপের চিন্তন এবং মনন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিক গ্রহণ করেছিলেন। য়ুরোপের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিপ্রেম, নরনারীর সমানাধিকার তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ফলেই তিনি সামন্ততন্ত্রের খোলস ভেঙে ব্যক্তিচিন্তার মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রেনেসাঁ চেতনার সঙ্গে ভারতবোধের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের আদর্শ সমুজ্জ্বলভাবে দল মেলেছে।

সদা জাগ্রত মন দিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনি বিশ্ব সংস্কৃতির মধু ভাণ্ডার থেকে এত বেশি গ্রহণ করেছিলেন, তার দানের পরিমাণও যে সেখানে বিপুল হবে তাতে অবাক হবার কিই বা আছে!

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সাম্রাজ্যবাদের প্রসার এবং তার ফলে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম, পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তদুপরি পর পর দুটি রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রবলের ক্ষোভ প্রতিহিংসাকে তিনি জ্বলন্তভাবে দেখতে পেয়েছেন। পরাধীন ভারতের বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ তার বুকে অতি শৈশবেই বেজেছিল ।

তারপর যতই বয়স বেড়েছে দেশপ্রেম মনে আরো প্রগাঢ়ভাবে ঘনীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম নিকষিত হেম যেন। দেশের প্রতি অন্ধ হয়ে সত্তার আলোময় স্বরূপ দিয়ে দেশের মাটিকে এমনভাবে কেউ ভালোবেসেছেন কিনা আমার জানা নেই। যাদের শতাব্দীব্যাপী দুঃখ দুর্দশা তিনি চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন ইতিহাসে পাঠ করেছেন, তাদেরকে হিংসার দিকে নয়, ঘৃণার দিকে নয় শান্তির ললিত উদার দিগন্তের পানে আপন বাণীর মন্ত্রশক্তিতে আকর্ষণ করার সেকি অনিন্দ্র প্রচেষ্টা! আপন দেশের হতভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে বিশ্বের হতভাগ্য দেশসমূহকে ভালোবেসেছেন। ফ্যাসীবাদ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, 'নাইট' খেতাব পরিত্যাগ করেছেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আরো কত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে সর্বপ্রকারের আত্মশ্লাঘা জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছিলেন। সেজন্য দেখি বৃদ্ধ বয়সের জড়তাকে উপেক্ষা করেও ব্রাত্য জাতহারা' রবীন্দ্রনাথ সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েট দেশ দর্শন করতে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভাষা নদীর স্রোতের মতো কেউ তাতে নিজের নাম লিখে রাখতে পারে না। কিন্তু বাংলাভাষায় নিজের নাম লিখে রেখেছেন। ভাষার মতো সংস্কৃতিকেও দেশসীমা কালসীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে না- অদলবদল রূপান্তরের মাধ্যমে ধাবমান হরিণীর মতো দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কালের বিবর্তনে জীর্ণ অংশ ঝরে যায়। নতুন প্রাণের স্পন্দনে নবাঙ্কুর গজায়। রবীন্দ্রনাথ অতীত বর্তমানের বিশ্ব সংস্কৃতির স্রোতে অবগাহন করে তার প্রাণের শিখা ছেঁকে পরিশ্রুতভাবে প্রকাশ করেছেন। আপন

বাণীর মতো করে জীবন রচনা করেছেন। বিশ্বাভিসারী প্রাণের উদার আকুতি কর্মের পাষাণগলা স্রোতে ভাষায়িত করেছেন ।

আমাদের আনন্দ আমাদের গৌরব রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে মানুষের উপযোগী ভাষা হিসেবে রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা মানুষ হওয়ার প্রেরণা পাই। রবীন্দ্রনাথের নাম মনে এলেই কিশোর কবি সুকান্তের সে কয়টি পঙক্তি বার বার মনে পড়ে যায়:

এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি
সোনার ফসল তুলে ধরে।

শিক্ষার দর্শন

ইউরোপীয় রেনেসাঁর পূর্বে শিক্ষার দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল অতীন্দ্রিয়বাদে প্রোথিত । মানুষ জানবে কেন? বুঝবে কেন? জ্ঞান লাভ করবে কেন? এই সবগুলো কেনর জবাব প্রাচীন জগৎ দিয়েছে– কোনো এক অলৌকিক সত্তায় তাকে বিশ্বাসী হতে হবে। যেহেতু মানুষের মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয় অসংযত, তাই তাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দৈনন্দিন শৃঙ্খলার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে চিত্তে চেতনায় স্থির করতে হবে, কোথাও তাকে সকল কিছু সমর্পণ করতে হবে। এই সমর্পণের পাত্রটি কোনো যুগে কোনো সমাজে বহু দেবতা, কোনো সমাজে এক আল্লাহ, কোনো সমাজে অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য জন্মান্তরবাদ। একটি শৃঙ্খলার মাধ্যমে একটি কিংবা বহু বিদেহী সত্তার প্রতি স্থির বিশ্বাসী করে তোলাই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা।

প্লেটো গ্রিসে গার্ডিয়ানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি। তিনি মনে করতে বাধ্য হয়েছিলেন পরম সত্তার বিষয়ের জ্ঞানের বলেই মানুষের সুস্থ সমাজ সৃজন সম্ভব। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্ম জ্ঞানকে ধরা হতো সকল জ্ঞানের কাণ্ড- আর সব জ্ঞান ডালপালাবিশেষ। বৌদ্ধযুগে শিক্ষা বলতে বোঝাতো নির্বাণের শিক্ষা। ইসলামিক জগতে কোরআনে অখণ্ড আস্থা স্থাপন এবং পরকাল-পরলোকে নির্দ্বন্দ্বে বিশ্বাস করার যে শিক্ষা দেয়া হতো তাই আদর্শ শিক্ষা বলে বিবেচিত হতো। মধ্যযুগের খ্রিস্টান ইউরোপের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই তো ছিল মা মেরীর পুত্র

যীশুর ঈশ্বরের সন্তানত্বে এবং বাইবেলের অলৌকিকত্বের প্রতি কোনোরকমের প্রতিবাদহীন অন্ধ আনুগত্যের এক 'মৌমাছি চক্র'।

আবার সে সকল মানুষকে অবতার পয়গম্বর সম্মান দেয়া হয় এবং যারা মনুষ্য জাতির শিক্ষক বলে পরিগণিত হয়ে আসছেন, তাদের সকলের বিষয়ে একটি নিরেট সত্য, তারা পরমতত্ত্বজ্ঞানী এবং একভাবে না একভাবে পরম সত্তার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন বলা হয়ে থাকে। মনুষ্য জাতির শিক্ষক। এই পয়গম্বর-অবতারদের বিষয়ে আরো একটি সাধারণ সত্য, তারা পতিতপাবন বা দরিদ্রজনের বন্ধু বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান দিয়ে তারা দরিদ্র জনগণের উপকার করেছেন । উপকার করেছেন সংশয়ের স্থলে বিশ্বাস দিয়ে এবং বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়ে।

সুতরাং লোকাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায় বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতাই হলো প্রাচীন জগতের শিক্ষা দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রিসে তার এক রূপ, ভারতে এক রূপ, চীনে এক রূপ এবং আরবে আরেক রূপ। মানুষের কেজো শিক্ষাকে নেহায়েত মামুলি ব্যাপার ধরে নেয়া হতো। এমনকি যে সকল বিদ্যা এবং তত্ত্বজ্ঞান আহরণে রীতিমতো সূক্ষ্মদর্শীতার প্রয়োজন তাও মনে করা হতো দেবতা কিংবা আল্লাহর কৃপাতেই সম্ভব হচ্ছে। মানুষের হাত পা চালানো মগজ মন খাটানোর প্রক্রিয়া আয়ত্ত করাকে কখনো অভিজাত শিক্ষার পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়নি। মানব শিশুর সঙ্গে পশু শিশুর প্রভেদ স্বল্প । মানুষ যেমন খায় দায়, ঘুমোয়- পশুও ওসব কাজ করে। সুতরাং কোনো দাম নেই। যদিও বা কখনো মানুষের মন মগজের ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে, তাও হয়েছে এ কারণে যে দেবতার

মূর্তি নির্মাণে ওগুলো কাজে আসে, আল্লাহর মহিমা কীর্তনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ও সকল কর্ম । প্রাচীন পৃথিবীর ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর মানুষের জীবনধারণ একভাবে না একভাবে দৈবের উপর নির্ভরশীল। তাই তার জৈব কর্ম, জৈবসৃষ্টিও দেবকাজে নিয়োজিত হয়ে প্রশংসনীয় হয়, অমরত্ব লাভ করে। মানুষ জীব, তাকে দেবতা করে তোলা যায় এবং তা সম্ভব একমাত্র ভক্তি বিশ্বাসের বলে। কোনো রকমের প্রশ্নশীলতার স্থান নেই। তাই প্রাচীন পৃথিবীর যে শিক্ষা দর্শন, তার মূল প্রতীতিই হলো দৈবের প্রতি মানুষকে আস্থাশীল করা। দৈব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মগজের শ্রম নিয়োজিত করাতেই জীবনের সার্থকতা।

.

২.

ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফলে মানুষের অনেক বিষয়ের সংস্কার যখন বীজপত্রের মতো খসে গেছে এবং সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মের অধীন, নিয়মগুলোকে অধিগত করলেই মানুষের মঙ্গল, এই বোধ ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে যখন মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে, তারপর থেকেই প্রাচীন শিক্ষা দর্শনের ভিত নড়ে ওঠে। মানুষের জাগতিক অস্তিত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক কেজো জ্ঞান এবং বিদ্যা, অধিবিদ্যার আসন দখল করে। কেজো বিদ্যার চর্চাই পৃথিবীতে অচিন্তিতপূর্ব যুগান্তর এনেছে। প্রাচীন পৃথিবীর হাড়গোড়ের উপর নতুন একটি পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রাচীন শিক্ষাদর্শনের

নিরিখে ছিল মানুষের সঙ্গে পরম সত্তার সম্পর্ক নিরূপণ । কিন্তু নতুন শিক্ষাদর্শনের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ালো, মানুষে মানুষে যে সামাজিক সম্পর্ক তার প্রকৃত ভিত্তি নির্ণয়। পাশাপাশি প্রাচীন শিক্ষাদর্শনও বেঁচে রইল, কিন্তু তার দাপট অবশিষ্ট রইল না, বেঁচে রইল গাছের মরা ডালের মতো হয়ে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ধর্মগুরু যে কারণে পতিতপাবন বা দরিদ্রজনের বন্ধু বলে খ্যাত হয়েছেন, মানুষের প্রতিটি বৃত্তির বিশ্লেষণ করে, পরিবেশ বিচার করে মানুষে মানুষে যে সহজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তার স্থান অধিকার করল নানা ধরনের মানবিক বিদ্যা। বস্তুত একজন বিশ্বাসী মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে যে ধরনের নির্মল আনন্দ অনুভব করেন, একজন ধর্মবিশ্বাসহীন মানুষ উন্নত সাহিত্য পাঠেও একই ধরনের আনন্দ পেয়ে থাকেন।

.

৩.

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁর পূর্বে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য ইউরোপ সামাজিকভাবে সংগ্রাম করে আসছিল, তা শিক্ষার দর্শনের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। যন্ত্র চালু রাখার জন্য যন্ত্রপাতিতে শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন, সুতরাং যান্ত্রিক শিক্ষা চালু হলো। এই যান্ত্রিক এবং কারিগরি শিক্ষা সামাজিকভাবে মানুষকে একপেশে করে ফেলল। অন্যদিকে কলা এবং মানববিদ্যাসমূহ যন্ত্রের প্রবর্তনের কারণে সমাজ জীবনে যে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশে ব্যর্থ হলো। তাছাড়া এই সময়ে গোটা শিক্ষা পদ্ধতি রাষ্ট্রায়ত্ব হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের সৈন্য প্রয়োজন। সৈন্য হিসাবে শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলেছে । রাষ্ট্রের ডাক্তার প্রয়োজন, ডাক্তার হিসেবে শিক্ষিত করেছে। রাষ্ট্রের কারিগর, মিস্ত্রি, শ্রমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের অনুপাতে রাষ্ট্র সবকিছু তৈরি করে নিচ্ছে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। তাই রাষ্ট্রের দর্শন এবং শিক্ষা দর্শন অনেক সময়ে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। তার ফল হয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব প্রয়োজনে ইতিহাসকে বিকৃত করে। একটি উদাহরণ দিলেও বিষয়টি খোলাসা হবে । বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। তার আগে বাংলাদেশের ছাত্রদের পড়তে হতো, ইসলামি রাষ্ট্রই হলো আদর্শ রাষ্ট্র, ইসলামি রাষ্ট্রের জনক জিন্নাহ সাহেব খুব ভালমানুষ। পাকিস্তানের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবকিছু শিক্ষা দেয়ার সময় কিছু মিথ্যা বলতে হতো। বাংলাদেশে জিন্নাহ্ ভাল লোক এক কথা আর শিক্ষাবিদেরা বললেন না, শিক্ষার্থীরাও শিখবে না। তার বদলে অন্য কাউকে ভাল বলতে হবে- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভাষা এবং সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার সময় প্রয়োজনীয় অদলবদল করে নিতে হবে। আধুনিক রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু সে রাষ্ট্র যা শিক্ষা দেয় তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিথ্যার মিশাল থাকেই; এই মিথ্যা মারাত্মক,মানুষের মনোবৃত্তিকে বিষিয়ে তোলার ক্ষমতা এর অপরিসীম। কোনো রাষ্ট্রই ধর্মরাজ্য নয়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব অস্বীকার করার কি কোনো উপায় আছে? অথচ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই সময়ে একটা বড় রকমের গলদ থাকে। সেটা হলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সত্যকে বিকৃত করা। ইংল্যান্ডের ছাত্রেরা ইংরেজ লেখকের লেখা ইংল্যান্ডের ইতিহাস একরকম করে পড়ে, আবার ফ্রান্সের ছাত্রেরা ফরাসী

লেখকের লেখা ইংল্যান্ডের ভিন্নরকম ইতিহাস পড়ে। ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণী ইচ্ছা করলে খুব সহজেই ফ্রান্সের জনমত ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, আবার তেমনি পারে ফ্রান্সের শাসককুল ইংরেজ ঐতিহ্য, ইংরেজি সাহিত্য ইত্যাদির অপমান করেছে ফরাসীরা। একথা অনায়াসে প্রচার করেই গোটা ইংরেজ জাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাড়িত করা সম্ভব। একইভাবে ফরাসীরাও তা পারে। এই অহেতুক জাতিগর্ব আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জেনেও রক্ষা করছে এবং তা করছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। গত মহাযুদ্ধে হিটলার গোটা জার্মান জাতিকে জার্মান সাম্রাজ্যের নামে যতটা উদ্দীপিত করতে পেরেছিলেন, তারও চেয়ে বেশি উদ্দীপিত করেছিলেন আর্যরক্ত, আর্যজাতি ইত্যাদির ধুয়া তুলে। যুদ্ধ ঘটে যুদ্ধের প্রয়োজনে, স্বার্থের তাগিদে। সে যুদ্ধকে ভয়াবহ করে তোলার পেছনে, জাতীয় গর্ববোধ, অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি ইত্যাদির অবদান সর্বাধিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ইটালি, জার্মানির নয় শুধু প্রতিটি রাষ্ট্র সচেতনায়, এই ধরনের জাতিআশ্রিত এবং ঐতিহ্যআশ্রিত নানা রকমের অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে রেখেছে। অন্ধ বিশ্বাস থেকেই একগুঁয়ে মনোভঙ্গির উৎপত্তি । রাষ্ট্রের ভিত্তি যার উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিশ্বাসের বিপরীত কোনো বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্র চলতে দিতে পারে না। অল্প কিছুদিন আগেও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডারউইনের আবিষ্কার পড়তে দেয়া হতো না, কেননা বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত আছে ডারউইনের আবিষ্কারকে সত্যের কাছাকাছি স্বীকার করে নিলেও বাইবেলের মত সত্য হিসেবে আর টিকছে না। প্রাচ্যের দেশসমূহে এই বদ্ধ সংস্কারের প্রভাব অনেকগুণ বেশি। রাষ্ট্রীয় দর্শনের সঙ্গে কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ের সামান্য গরমিল হলেই সেগুলোর পঠন-পাঠন এবং চর্চা বন্ধ করে দেয়া হয়। সব বিষয়ে অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে আধুনিক রাষ্ট্র শিক্ষার পুরো দায়িত্ব গ্রহণ

না করলে একদিকে যেমন চলে না। আবার অন্যদিকে রাষ্ট্র শিক্ষাদর্শকে রাষ্ট্রাদর্শের ছাঁচে বাঁকাতে গিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এখন একটা প্রচণ্ড রকমের সংকটের সম্মুখীন। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার একটি বিরোধ রয়েছে। আবার প্রতিটি রাষ্ট্রের শিক্ষার আলাদা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি মানব জাতির সহজ সম্বন্ধকে অনেকাংশে আঁটোসাঁটো করে তুলেছে। একেক জাতি মানব ইতিহাসকে একেকভাবে ব্যাখ্যা এবং বিচার করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এর কোনোটিই হয়তো সত্যি নয়। কিন্তু এই প্রিয় মিথ্যা প্রতীতি নিয়ে প্রতিটি জাতির গর্বের অন্ত নেই। এই অহেতুক ভেদবুদ্ধি মানুষে মানুষে অবারিত সম্পর্কের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।

এ ছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্নদিক দিয়েও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কারিগরি এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে শিক্ষিত ছাত্রগণ সমাজের মানব সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয়ে অজ্ঞই থেকে যান। অনেক সময় এই কারিগরি এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষার্থী মানব জাতির কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ে চিন্তা করার কোনো অবকাশই পান না। তাদের কোনো কাজের জন্য যে মানব জাতির কিছু যায় আসে, এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। আর তার অবকাশও নেই। অন্যদিকে মানববাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগের কারণে মানুষের সমাজে স্থূল সূক্ষ্ম কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে ব্যাখ্যা বিচার করে সাধারণের কাছে বোধগম্য করে তুলতে পারছেন না। তার ফল দাঁড়াচ্ছে, একটি সমাজের মধ্যেই অনেক সমাজ সৃজিত হচ্ছে, অথচ এই অন্তবর্তী সমাজগুলোর মধ্যে হার্দ্য কোনো সংযোগসূত্র নেই এবং কোনো ন্যায়

অন্যায়ের জন্য কাউকে দায়ী করারও কোনো পন্থা নেই। রেনেসাঁ পূর্ব ইউরোপ এবং প্রাচীন পৃথিবীতে যেমন হয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্রভিত্তিক, যন্ত্র এবং যান্ত্রিকতাভিত্তিক ও কলাভিমানী ব্যক্তিদের অভিমানভিত্তিক অনেকগুলো ডগমা বা বদ্ধ সংস্কার হালের পৃথিবীর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছে।

.

৪.

ভাবী সুষ্ঠু শিক্ষা দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু কি হওয়া উচিত? এক কথায়, এর উত্তর দেয়া সহজসাধ্য নয়। সভ্যতার বিস্তার, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার এবং সাক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্বপরায়ণ জাতিগুলোর অহংপুষ্ট ধারণায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কোনো জাতি এককভাবে সভ্যতার একচেটে মুদির দোকানী এই দাবি অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে করতে পারবে না। সভ্যতা কোনো দেশ জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়-অথচ প্রতিটি তথাকথিত সুসভ্য জাতির মধ্যেই এই সভ্য অভিমান প্রচণ্ডভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাইরের দিকে হয়তো দেখা যায় না– কিন্তু গ্লাসিঅরের মতো ভিতরের দিকে অনেকদূর সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষ যা সৃজন করেছে, নিজের বোধবুদ্ধিকে যতদূর মুক্তি দিতে সম্ভব হয়েছে তা সংকীর্ণ দেশীয়তা আর জাতীয়তার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, অন্যদিকে জৈব প্রয়োজনেই দেশসীমা জাতিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। এইখানেই হলো যাবতীয় বিপত্তির উৎস। যেহেতু মানুষ বলবান শীলিত বুদ্ধির প্রয়োগে

এই দ্বন্দ্বের কোনো স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি, তাই রবোট হওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়েও তাকে রবোটে পরিণত হতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে এই কারণে যে মানব জীবনে চূড়ান্ত লক্ষ্য কি সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা। আগেকার নবী পয়গম্বরেরা মানব জীবনের চরম পরম লক্ষ্য বলতে বুঝতেন পরম সত্তার জ্ঞান। এই কালের মানব জীবনের পরম লক্ষ্য কি? সম্ভবত মানুষের সমস্ত সম্ভাবনা বিকশিত করে তোলাই যদি বলা হয়, আশা করি অন্যায় হবে না। কিন্তু দেশ, জাতি এবং সম্প্রদায় বিভক্ত পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন সম্ভব নয়, যেমন উপজাতীয় সমাজে যন্ত্রবিজ্ঞানের কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। মানব জাতি এক, তাদের স্বার্থ, কল্যাণ এক এবং অবিচ্ছিন্ন। সমস্ত মানুষকে এক জাতিভুক্ত, গোটা পৃথিবীকে একটি রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত, মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তিকে কোনো রকমের পূর্বসংস্কার ব্যতিরেকে নির্মোহভাবে অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় ধরে নিয়ে, জীবন আরো সুন্দর, মানুষ আরো ভাল এবং স্বাধীনতা আরো কাঙ্ক্ষিত ধন- কোনো রকমের স্বর্গ নরকের ভয়ভীতিহীন জীবনের নব দর্শনের মধ্যেই রয়েছে আগামীর মহীয়ান শিক্ষাদর্শনের ইঙ্গিত। মানুষের ভবিষ্যৎ ভালোবাসায় এবং ভালোবাসার নব নব সূত্র এবং ক্ষেত্র উদ্ভাবনের মধ্যেই কল্যাণশীল শিক্ষার অঙ্কুর সুপ্ত রয়েছে।